তন্ত্রতত্ত্ব।

———:০:———

আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং
তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়ানাং।
নারাধয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি! যে ত্বাং
নিঃশ্রেণিকাগ্রমবরুহ্য পুনঃ পতন্তি॥"

———০::০———

৺সর্ব্বমঙ্গলা সভার সম্পাদক
সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রচারক পণ্ডিতবর—

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য

মহোদয় কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত।

———০::০———

কলিকাতা

নিউ টাউন প্রেসে মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৮১৫

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।
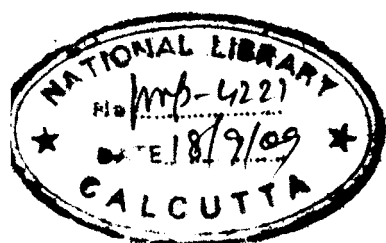
শ্রীশ্রীশ্বরী সর্ব্ব মঙ্গলা বিজয়তে

অবতারণা।

সর্ব্বমঙ্গলার [illegible]ভূমি ভারতবর্ষে আবার যেন সনাতন ধর্ম্মের মধুর মঙ্গল বিজয়দুন্দু[illegible]য়া উঠিয়াছে। যন্ত্রাবলীর মন্দ্রমন্থর মন্ত্রগুণে বাদ্যবোধনিপুণ বুদ্ধিমান্ যেমন প্রতিলয়ে তাল দিতে স্বতএব বাধ্য, ধ্বনি-প্রিয় স্বরমুগ্ধ অবোধ শিশু ও তেমনি স্বভাবের আকর্ষণে শিরঃ কম্পন, অ-ঙ্গুলীচালন, করতালী নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা প্রতিলয়ে সেই রূপ তাল দিতে বাধ্য। আজ সনাতন ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলনে ভারতে ও তেমনি সুবোধ হউন অবোধ হউন্, আর্য্যসন্তান মাত্রেই সেই মোহন মন্ত্রের মধুর স্বরে মত্ত হইয়া প্রতিলয়ে তাল দিয়া নাচিতেছেন। এই মহামহোৎসবে—ভারতের এই চিরন্তন দুর্গোৎসবে, চণ্ডীমণ্ডপের বিশাল বিশ্বপ্রাঙ্গনে জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, অনেক যন্ত্রই বাজিতেছে, কিন্তু দেখিয়া দুঃখ হয়, সকল যন্ত্র যাহার অন্তর্ভুক্ত এবং মুখাপেক্ষী, সেই যন্ত্র মন্ত্রের এক মাত্র প্রসবভূমি মহাযন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্র আজ্ নীরব। জানি ইহা, মন্ত্রময় তন্ত্র-শাস্ত্র মন্দিরের অভ্যন্তর ভিন্ন প্রাঙ্গনে বাজিবার যন্ত্র নহে; সিদ্ধ সাধকের হৃদয় ভিন্ন, সভায়—সমাজে আলোচনার বস্তু নহে, কিন্তু কি করিব, আমরা যে বাহিরের বাদ্যকর। মন্দির মধ্যে সাধকের সিদ্ধ মুখে মধুর মন্ত্রের মন্দ্র ধ্বনি আর সেই সঙ্গে তাঁহারই হস্তে ঘণ্টার সেই জয় ধ্বনি না শুনিলে স্নান, আরতি, বলি, ভোগ কি বাজাইব তাহা যে ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আজ্ এত আন্দোলন, আলোচনা, বক্তৃতা, ব্যাখ্যার মধ্যে ও যে ধর্ম্ম প্রচারের এত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার এক মাত্র কারণ, কেবল ঐ মন্ত্রহীন পূজার প্রাঙ্গনে বাদ্য যন্ত্রের বিষম কোলাহল। সে যন্ত্রে না আছে কাল, না আছে তাল, না আছে মান, না আছে গান। পুজাক্ষেত্রে হয় ত মহাস্নানের আরম্ভ ও হয় নাই, কিন্তু বহিরঙ্গনে হোমের পূর্ণাহুতি বাজিয়া উঠিল। অনুষ্ঠান—ধর্ম্মের নাম শুনিলে যে সমাজ সভয়ে কম্পিত মজ্জাগত জ্বরগ্রস্ত; দুঃখের কথা

বলিব কি, সেই সমাজ আজ্ নির্ব্বিকল্প সমাধি, বিদেহ কৈবল্য, তত্ত্বজ্ঞান, পরা ভক্তি ও নির্ব্বাণ মুক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিগূঢ় তত্ত্বনির্ব্বাচনে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত। তাই অকালে এ যে তাল বাদ্য অসাধ্য এবং অসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই সিদ্ধিসাধনহীন সমাজের দর্শনবিজ্ঞানময় বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া অধিকাংশস্থলেই আমাদের, গ্রাম্য (বার ইয়ারি) পূজার কথা মনে হয়। পূজার অবস্থা দেখিয়া যেমন আশঙ্কা হয়, হয় ত কালে প্রতিমা খানিও উঠিয়া যাইবে, বর্ত্তমান সমাজের দশা দেখিয়াও তেমনি অনেক সময়ে আশঙ্কা হয়, হয় ত কালে আর্য্য সমাজ হইতে সিদ্ধি সাধনার বার্ত্তা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু ভরসা এই যে, চন্দ্র সূর্য্যের গতিস্তম্ভ সম্ভব হইলে ও এ পূজা কখন গ্রাম্য পূজা হইবার নহে। সাধারণের সম্পত্তি হইলে ও ইহা চিরকাল অসাধারণ, এবং চিরকাল অসাধারণ হইলে ও চিরকাল আর্য্যসাধারণ প্রত্যেকে স্বয়ং স্বতন্ত্র সাধকরূপে এ পূজার পূর্ণাধিকারী। পুরোহিত ইহার প্রতিনিধি নহেন, পূজার অর্থ ও আত্ম-বঞ্চনা নহে, কিন্তু আত্মার সিদ্ধি ও সাধনা। এ সাধনার মন্দিরে আমরা যে মন্ত্রের মুখাপেক্ষী, পূজকগণ সে মন্ত্রপাঠ করিতে বিরক্ত নহেন, কিন্তু সন্দিগ্ধ; অসমর্থ নহেন্ কিন্তু আশঙ্কিত। তাই আশা হয়, এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিলে, এ আশঙ্কা দূর করিতে পারিলে এমন এক দিন অচিরাৎ আসিতেছে, যে দিন ভারতের দশ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া অসংখ্য আর্য্য কণ্ঠে সমস্বরে নিনাদিত হইবে—"নচ তন্ত্রাৎ পরং শাস্ত্রং নচতন্ত্রাৎ পরোগুরুঃ নচ তন্ত্রাৎ পরঃ পন্থা নচ তন্ত্রাৎ পরাগতিঃ" সেই আশার উদ্যমেই আজ্ সাধক সমাজকে অবলম্বনস্তম্ভ করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে এই অভিনব অবতারণা। অনেকে বলিতে পারেন, সাধন মন্ত্রে যখন সন্দেহ ঘটিয়াছে, তখন তাহার অপনোদন সহজ ব্যাপার নহে। আমরা ও এ কথা অস্বীকার করি না। তবে, বলি এই যে, সহজ নহে বলিয়াই একেবারে অসম্ভব নহে, "সন্দেহ ঘটিয়াছে" ইহাই শুভসংবাদ। পিপাসা যখন জাগিয়াছে, তখন জলের জন্য ভাবনা নাই, তীরপর্য্যন্ত নীরপূর্ণ

অগাধ সরোবর সম্মুখে বিরাজিত কেবল অবতারণার অপেক্ষা মাত্র। অনন্ততত্ত্বপীযূষপূর্ণ অপার তন্ত্র শাস্ত্র সম্মুখে সুসজ্জিত থাকিতে আর্য্য-সন্দেহ ভঞ্জনের ভাবনা নাই, কেবল ধীরে ধীরে তত্ত্বপথে অগ্রসর হইবার অপেক্ষা মাত্র। দুঃখের কথা এই যে. পিপাসা জাগিয়াছে, সরোবর সম্মুখে রহিয়াছে, এরূপ স্থলে ও জল পানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার আবশ্যক হইয়াছে। ফলতঃ বিজ্ঞাপন, জল পানের জন্য নহে, পথ পরিষ্কার করিবার জন্য। তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের বড়ই বিচার বিবাদ বিতর্কের দিন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্তস্তত্ত্ব প্রবেশের পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই জটিল, বড়ই সংশয়াচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ কণ্টক, এ সংশয়, সরোবরের দোষে নহে, গতি বিধির অভাবে। ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এক কালে এমন সুখসৌভাগ্যগরিমার দিন ছিল, যে কালে আর্য্য সাধকগণ গৃহে বসিয়াই গুরুদত্ত তত্ত্বামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন, স্বয়ং তীর্থে অবগাহন করিবার একান্ত আবশ্যক ছিল না। নিয়তিচক্রের কঠোর নিষ্পীড়নে ভারত বর্ষ আজ্ সে দিন হারাইয়াছে, একে একে সাধককুল-চূড়ামণিগণ করুণাময়ীর কৈবল্যময় চরণাম্বুজে বিলীন হইয়াছেন। সদ্‌গুরুর অভাবে শিষ্য সম্প্রদায় ঘোরান্ধকারে হাহাকার করিতেছেন। জানি না, জগদীশ্বরী কতদিনে আবার করুণা কটাক্ষের উজ্জ্বল আলোকে ভক্ত হৃদয় আলোকিত করিবেন, কত দিনে আবার এই অধঃপতিত সমাজের মাতৃহারা অন্ধ সন্তানগণ চৈতন্যনয়নে চৈতন্যময়ীর সৌন্দর্য্যচ্ছটায় ডুবিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া—মা মা বলিয়া আনন্দময়ীর ক্রোড়ে উঠিবে। কত দিনে আবার শুনিব "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। তন্ত্র পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু লোকের মুখে কেবল সেই বিভীষিকার বার্ত্তা শুনিয়া চিরকাল সভয়ে চিন্তা করিলেও ত কখন কণ্টক বিদূরিত হইবার নহে। পথ চাহিলেই পথে দাঁড়াইতে হইবে। পথের কণ্টক নহে, বাহিরের কণ্টক আসিয়া পথে পড়িয়াছে—ভয় নাই, অন্তঃসারহীন শুষ্ক কণ্টক

সাধকের বীর পদ নির্ভয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, এই আশঙ্কায় সাধক মণ্ডলীর পদপ্রান্ত লক্ষ্য করিয়া পাদুকাস্বরূপ মধ্যস্বভাবে আমরা অগ্রসর হইলাম, ক্ষত বিক্ষত জর্জ্জরিত ছিন্ন ভিন্ন হই, আমরা হইব, তথাপি সাধক চরণ হৃদয়ে ধরিয়া তত্ত্বপথে উপনীত হইয়া একবার তত্ত্বামৃত মহাহ্রদে ডুবিব, অন্তরে এ আশা নিতান্ত বলবতী। ভরসা করি, সিদ্ধ সাধু সাধক মণ্ডলী আমাদের এ আশা পূর্ণ করিতে বিমুখ হইবেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ক্ষেত্রে অনেক তন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, অনেক তন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে, তন্মধ্যে মহাত্মা রামতোষণ ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত, এবং প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয়ের প্রকাশিত প্রাণতোষিনী, যথার্থই সাধক সংসারের প্রাণতোষিণী। তৎপর রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক গুলি তন্ত্রের সহিত যে সানুবাদ তন্ত্রসার প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আর্য্য সমাজ তাঁহার নিকটে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন। অনেক তান্ত্রিকতত্ত্বের ছায়া সাধকবৃন্দের হৃদয় দর্পনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সকল অস্ফুটচ্ছায়াই নিবিড়সংশয়ময়ী বিভীষিকার কারণ হইয়া উঠিয়াছে—অনধিকারে শাস্ত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ের গ্রন্থিচ্ছেদ হওয়া দূরে থাক্, অধিকন্তু জটিল গ্রন্থি সকল বদ্ধমূল হইতেছে। তথাপি ইহা কল্যাণের হেতু বলিয়া বোধহয়। কারণ এই সকল সংশয় হইতেই সমাজে শাস্ত্রীয়তত্ত্বের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রাণ তোষিণী ও তন্ত্রসার ভিন্ন তন্ত্র সম্বন্ধে আর যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছে, সেই গুলিই তত্ত্ব পথের কণ্টক। কত গুলি অপরিনামদর্শী নিরক্ষর ব্যবসাদার, কতগুলি ঐন্দ্রজালিক তত্ত্বের ধূর্ত্ত আবিষ্কর্ত্তা, আর কতগুলি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নিরম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকর্ত্তা, এই ত্রিপুষ্কর একত্র হইয়া তন্ত্রের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন। ইঁহাদেরই কল্যাণে আজ্ সমাজ রসাতলে যায় যায়। কত শত সরল হৃদয় সাধু পুরুষ ইঁহাদের বিষম প্রলোভনে প্রতারিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। তত্ত্ব না বুঝিয়া গুরুগম্য বিষয় সকলের অনুষ্ঠান প্রণালী

হাটে মাঠে ঘাটে আনিয়া লোকের যে বিড়ম্বনা ঘটিতেছে, তাহাতেই শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে, এই অবিশ্বাস নির্ম্মূল করিতে হইলে শাস্ত্ররূপ অস্ত্রভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্রের দ্বারে দাঁড়াইয়াই শাস্ত্রীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে। তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহা একবার তন্ত্র হইতেই বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উপাসনা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ এই যে—বিশ্বাস ঘটিলে তবে ত অনুষ্ঠান করিবার কথা, কিন্তু তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল গূঢ়াতিগূঢ়তম রহস্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা বিশ্বাস করা দূরে থাক্ শুনিয়াই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্র, কেন এ সকল বিষয়ের অনুশাসন করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধিবৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তখন মানবের ভ্রান্তিসুলভ বুদ্ধিমীমাংসায় বিরক্তি, বিদ্বেষ, অশ্রদ্ধা, অভক্তি বই আর কিছুই স্থান পায় না। এইরূপ সাধারণের অবিজ্ঞাত কোন গূঢ় বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, যাহা সাধারণে বিখ্যাত এবং বিজ্ঞাত, তাহারই মধ্যে দেখিতে পাই, এক, ষট্‌চক্র সম্বন্ধে কতই ব্যাখ্যা, কতই অনুভব, কতই প্রত্যক্ষসিদ্ধি, তাহার স্থিরতা নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিত্যনব ধর্ম্মতরঙ্গে উভয় কুল হারাইয়া যাঁহারা কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আজ্ কাল্ কুল-কুণ্ডলিনীর দোহাই দিয়া কুল পাইতেছেন।

তদ্ভিন্ন আর এক দল উপনিষদ্ভক্ত যোগবাশিষ্ঠ-শিষ্ট যোগী আছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই বলিয়া থাকেন, সত্য সত্যই শরীরের মধ্যে স্বচ্ছ সরোবর আছে, সেই সরোবরের বিকশিত কমলদলই ষট্‌চক্র। এই দুঃখেই সাধক কবি রাম প্রসাদ বলিয়াছেন " মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে, ওরে উন্মত্ত! আঁধার ঘরে, সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাব কি তাঁয় ধরতে পারে"—তিনি কিন্তু, কমল-মধুপান-মত্ত-কষায়-কণ্ঠে গাহিয়াছেন " কালী, পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করছে রমন "। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শাস্ত্রের এ অবমাননা সহ্য করা কঠিন হইয়াছে। ইহার পর আর এক সম্প্রদায় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আছেন, যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া

থাকেন, কালী বলিতে " কসাই কালী " তন্ত্র বলিতে " আবগারির দোকান " শিব গাঁজায় দম্ দিয়া তন্ত্র শাস্ত্র লিখিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল অনার্য্যের কথায় কর্ণপাত করিবার সময় আমাদের নাই-কারণ. দুর্গোৎসবের ঢাক বাজিলেই ছাগের কণ্ঠে চিৎকার আরম্ভ হয়-তাই বলিয়া দুর্গোৎসব উঠিয়া যাইবেনা, যে সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্থল দক্ষ-যজ্ঞ, তাহার ভাবনা বীরভদ্র ভাবিবেন।

জানি, এ সকল কথার হেতু আছে, তাই বলিয়া, কালীর অপরাধ, শিবের অপরাধ, তন্ত্রের অপরাধ কি? দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা এই সকল কথা বলেন—জানি, তাঁহারা ও তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত—কিন্তু কি করিব৷ পতির অন্নধ্বংস করিয়া উপপতির গুণগান করা ব্যভিচারিনী-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম!!! যাহার ধর্ম্ম, সে অধঃপাতে যাউক্, তাহার জন্য দুঃখ নাই. দুঃখ এই যে-এই সকল নরাধমের আলোচনায় আন্দোলনে আদর্শে সাধক সমাজ নিরন্তর জর্জরিত মর্ম্মাহত উৎসাদিত প্রায়। সন্তান হইয়া রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া, শক্তি সত্বে, বিশ্বজননী বিশ্বপিতার পবিত্র নামে এ কলঙ্ক গ্লানি গঞ্জনা কে সহ্য করিতে পারে? সিদ্ধি সাধনার মূলে এ কটূক্তি কুঠার ঘাত কাহার হৃদয় না ব্যাথিত করে? সাধক সমাজের সেই নিদারুণ মর্ম্মব্যথার অপনোদন জন্যই আমাদের এ আরম্ভ। আশা করি অসুরনাশিনীর অভয়নামে এ বিজয় পতাকার আনন্দদণ্ড ধারণ করিতে আর্য্যকুলকুমারগণ কখন কুণ্ঠিত হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ; আর্য্যসমাজে যাঁহারা সম্প্রতি দীক্ষিত বা দীক্ষাভিলাষী, আমরা অনেক স্থানেই দেখিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে অধিকাংশ সাধকই কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ নানা পথে বিচরণ করিতেছেন। কাহার ও গুরুদেব হয় ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা স্ত্রীগুরুর নিকটে দীক্ষিত, কেহ বা নিজগুরুর অনুপযুক্ততা জানিয়া দুঃখিত, কেহ বা সন্ন্যাসীর শিষ্য, গুরুদেব কোন্ দিগ্ দিগন্তে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন, কাহারও বা গুরুপুত্র মাত্র আছেন, তিনি ও অপ্রাপ্তবয়স্ক, অকৃতবিদ্য বা অদীক্ষিত,

কাহারও বা গুরুকুল নির্ম্মূল, আবার, কেহ বা সাঙ্খ্যবাদ আধ্যাত্মিকবাদ ছাপার তন্ত্রশাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত দেখিয়া, একটি একটি করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গগণনা করিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন, ইহা কর উহা করিও না—কিন্তু কেন ইহা করিব, কেন উহা করিব না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেরই চক্ষুঃ স্থির। শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাস করিতেছি না, ইহা উহা করিলে কোন ফল হইবে না, তাহাও বলিতেছি না, কেবল, যাহা করিতেছি, তাহা কি, ইহাই জানিতে চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও জানিবার উপায় নাই। উন্নত সমাজের শীর্ষে এমনই নির্ঘাতবজ্র পড়িয়াছে যে, ইষ্টদেবতার মূল-মন্ত্রের—আবার কোন অর্থ আছে, এ কথা জানা দূরে থাক্, বিশ্বাস করিতেই অনেকে পরাঙ্মুখ। না জানিলাম, তাহাতেও ক্ষতি ছিল না,—কিন্তু যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের যাহা কিছু করি—সেই শাস্ত্রই আবার বলিতেছেন—না জানিয়া না বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলেও কোন ফল হইবে না, কেন না তাহা অবৈধ। কুলার্ণবে—

দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তি মজানতাং।
কৃতার্চ্চনাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি ॥

শাম্ভবি! দেবতার স্বরূপ, যন্ত্রের তত্ত্ব এবং মন্ত্রের শক্তি যাহারা জানে না, তাহাদের কৃত অর্চ্চনাদি সমস্ত ব্যর্থ হয়।

শাস্ত্রের এ মহাবাক্য অবিশ্বাস করিতেও পারি না, কারণ, যে শাস্ত্রের বিধি মানিব, তাহার নিষেধ না মানিলে বলিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ "না বুঝিয়া না জানিয়া করিলেও যে কোন ফল হইবে না" ইহার প্রমাণ ত হাতে হাতে—আমি যাহার সাক্ষী, তাহা আমি অবিশ্বাস করিব কি করিয়া? না বুঝিয়া করিলে যে, কোন ফল হয় না, তাহাত নিজে বিলক্ষণ বুঝিতেছি। তাই, এ নিষেধ মানিতে হইবে, নিষেধ মানিতে হইলেই জানিতে শুনিতে বুঝিতে হইবে। বুঝিব যাঁহা-দিগের নিকটে, তাঁহাদের কথাত পূর্ব্বেই বলিলাম। এই সকল ঘটনা-বশতঃ এক্ষণে এমন কোন উপায় উদ্ভাবনের একান্ত আবশ্যক উপস্থিত হইয়াছে— যাহাতে বোধের অভাবে অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে না হয়—বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া কেহ সীমন্তস্থিত স্যমন্তক মণিকে

পদদলিত না করেন—নিত্যপূজাদির অনুষ্ঠানকে কেহ পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ না করেন—আমি অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারি, বা না পারি, যে তত্ত্ব পাইয়াছি, তাহা অভ্রান্ত সত্য—যে পথে যাত্রা করিয়াছি, তাহাও সেই রাজরাজেশ্বরীর রাজধানীর সুপ্রশস্ত রাজপথ—এ বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ ফল অন্তরে অটল থাকা চাই। বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্রানুসারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে যে পর্য্যন্ত সুযোগ সম্ভাবিত হইতে পারে—তাহা চিন্তা করিয়াই আমরা এই তন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশরূপ মহাব্রতে অগ্রসর হইলাম এ ব্রত অবশ্য মহৎ হইতেও মহৎ, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম; ভিক্ষুকের গৃহে রাজসূয় যজ্ঞ মনে করিতেই হাসি পায়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব? পেটেক্ষুধা মুখে লজ্জা চলে না। দ্বিতীয়তঃ এ পথে যে দাঁড়ায় তাহার লজ্জা না থাকিবার ই কথা—কেন না, যিনি নির্লজ্জের শিরোমণি দিগম্বর, তিনিই তন্ত্র শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। বিশেষতঃ, ভিক্ষুক বলিয়া ত এ পথে লজ্জার কোন কথাই নাই। যিনি প্রথমে এ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পথ দেখাইয়াছেন, তিনি নিজেই ভিক্ষুকের চূড়ামণি । ত্রিভুবনে রাজরাজেশ্বর হইয়া ও তিনি বিশ্বজননী অন্নপূর্ণার দ্বারে নিত্য ভিক্ষুক। আমরা সেই ভুবন বিখ্যাত ভিক্ষুক প্রভুর দাসানুদাস হইয়া লজ্জিত হইব কেন? ভিক্ষাই আমাদের রাজার রাজকর—মায়ের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া মায়ের উপাসনা [গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা] ইহা ই আমাদের উপাসনার মূলতত্ত্ব, ইহাতে যদি ভিক্ষুক বা লজ্জিত হইতে হয়, তবে কে ভিক্ষুক নহে, কে লজ্জিত নহে, তাহাত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভিক্ষুক ত্রিজগৎ, কিন্তু, ভিক্ষাদাত্রী সেই জগদ্ধাত্রী ভিন্ন আর কেহ নাই। সাক্ষাতে হউক, পরোক্ষে হউক, তিনিই এক মাত্র ভরসা—তাই ভরসা করি, সাধক-হৃদয়-বিহারিনী জীবযন্ত্র-পরিচালিনী বুদ্ধি-রূপিণী অন্নপূর্ণা, ভক্তবৃন্দের হস্তে তাঁহার নিজ অন্ন দিয়া আমাদের ভিক্ষা পাত্র পূর্ণ করিবেন। বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদে, বিশ্বমাতার প্রসাদে, আমাদের এ নিঃস্ব গৃহে ও তন্ত্রতত্ত্ব-রাজসূয়ের চরম দক্ষিণা দক্ষিণা-চরণাম্বুজে সমাহিত হইবে । ইতি

৺ কাশীধাম শকাব্দ-১৮১১। শ্রীশিবচন্দ্র শর্ম্ম বিদ্যার্ণব।

শ্রীশ্রীশ্বরী সর্ব্ব মঙ্গলা বিজয়তে।

তন্ত্রতত্ত্ব।

মঙ্গলাচরণম্।

১

যা লীলামুরলীবিনোদমধুরঃ শ্রীরাধিকাবল্লভো
যা সূরঃ প্রভয়া প্রভাসিতজগদ্ বার্দ্ধাঙ্গকামাঙ্গহা।
যা স্বাঙ্কে স্বয়মেব নন্দনতয়া হেরম্বরূপাম্বিকা
তাংত্বাং কালবিলাসলালসতনুং বন্দে ত্রিলোকপ্রসূম্॥

২

মহাকালস্যোরঃস্থলকুসুমশয্যাধিশয়িতা
পরানন্দশ্রান্তা জিতজলদকান্তা কুসুমিতা।
লতা কাচিৎ শ্যামা শিরসি ধৃতসোমার্দ্ধসুষমা
হৃদারামে সামে ফলতু কুলকৈবল্যমহিমা॥

৩

দিগম্বরনিতম্বিনীং ললিতনীলকাদম্বিনীং
চলৎকুটিলকুন্তলোচ্ছলিতকান্তিধারাধরাং।
মৃদুল্লসিত-বিভ্রমদ্-ভ্রমর-বিভ্রমাপাঙ্গয়ো
বিমুগ্ধবরভৈরবাং শ্রয় হৃদয় মাভৈ-রবাম্॥

৪

সদানন্দ-হৃদানন্দ—বিধায়ি-চরণদ্বয়ীং।
যন্ত্রস্থমন্ত্রপ্রতিমাং তন্ত্রতত্ত্বময়ীং নুমঃ॥

৫

মাতস্ত্বং নিগমাগমপ্রসবভূঃ শক্ত্যাচ শাক্তেন চ
ধাত্রীত্বং নিগমাগমস্থিতিমতী শক্ত্যাচ শাক্তেন চ।
পাত্রীত্বং নিগমাগমাশ্রয়ময়ী শক্ত্যাচ শাক্তেন চ
ভূয়া মে নিগমাগমপ্রলয়ভূঃ শক্ত্যাচ শাক্তেন চ॥

সর্ব্ব মঙ্গলে !

১

যিনি লীলা প্রসঙ্গে মুরলীধ্বনি-বিনোদরঙ্গে মধুরমূর্ত্তি রাধিকাবল্লভ, নিজ প্রভায় ত্রিজগৎ প্রভাসিত করিয়া যিনি সূর্য্য মূর্ত্তি, যিনি নিজ নিত্য-দেহের অর্দ্ধাংশে [দক্ষিণাঙ্গে] কামাঙ্গহর [শশিশেখর] আবার যিনি অম্বিকা [জননী] হইয়া ও আনন্দলীলায় নিজ অঙ্কে নিজেই নন্দনরূপে হেরম্ব-মূর্ত্তি, মহাকালের বিলাসলালসাময়-কলেবরধারিণী ত্রিলোক প্রসবিনী সেই তোমাকে প্রণাম করি ॥

২

মহাকালের বক্ষঃস্থলরূপ সুকোমল কুসুম শয্যায় অধিশয়িতা, পরমানন্দরসোন্মত্তা, রূপে জলদকান্তির এবং লীলায় জলদকান্তার [সৌদামিনীর] বিজয়িনী, সীমন্তশোভিত-অর্দ্ধেন্দু-সুন্দরী সেই কুসুমিত শ্যামলতা আমার হৃদয়রূপ উপবনে কুলতত্ত্বরূপ কৈবল্যফলে ফলিত হউন্ ॥ [এই শ্লোকটির রূপকাংশের তাৎপর্য্য সাধারণ সমাজে অপ্রকাশ্য হইলে ও ভরসা করি তত্ত্বপথচতুর সাধক সম্প্রদায়ের নিকট তাহা অবিদিত থাকিবে না] ॥

৩

চঞ্চল কুটিল কুন্তলচ্ছলে উচ্ছলিত কান্তিময় ধারা-ধরা, দিক্ এবং অম্বর-ময়-নিতম্বিনী (পক্ষান্তরে) দিগম্বর-নিতম্বিনী, বিভ্রমদভ্রমর-বিভ্রমময় অপাঙ্গদ্বয়ের মৃদুমধুর উল্লাসভরে বরভৈরব-মোহিনী মাভৈ-রব-ধারিণী সেই ললিতনীলকাদম্বিনীকে হৃদয় ! আশ্রয় কর ॥

৪

সদানন্দের হৃদয়ানন্দ-বিধানকারি-চরণদ্বয় ধারিণী মহামন্ত্রস্থ-মন্ত্রমূর্ত্তি তন্ত্রতত্ত্বময়ী পরম দেবতার পদাম্বুজে প্রণাম ॥

৫

মা ! তুমি শক্তি এবং শাক্ত (শক্তিমান্) এই উভয়রূপে নিগম ও আগম উভয় শাস্ত্রের প্রসবভূমি, পার্ব্বতীরূপে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই নিগম এবং শিবরূপে যাহা বলিয়াছ, তাহাই আগম। তুমিই শক্তি এবং

শাক্ত উভয় মূর্ত্তিতে সেই নিগমাগমের ধাত্রী হইয়া পালন করিতেছ, শক্তি সাধিকা এবং শাক্ত সাধক এই উভয়রূপেই শিবতত্ত্ব এবং শক্তি-তত্ত্বের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানে তুমিই তন্ত্রশাস্ত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছ। আবার, তুমিই শক্তি এবং শাক্ত রূপে নিগমাগমের আশ্রয় স্বরূপা হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছ তন্ত্রশাস্ত্রে যাহা কিছু সাধন-প্রণালী ব্যবস্থিত হইয়াছে—সে সমস্তই শিব শক্তি স্বরূপে তোমাতে সমাহিত হইয়াছে—তাই বলিতেছিলাম মা! এ সংসারে নিগম আগমের প্রসব পালন ও রক্ষা তিন কার্য্যই তুমি করিতেছ, কিন্তু পার নাই কেবল সংহার করিতে। কেন না, মন্ত্রময় তন্ত্রশাস্ত্র তোমারই রূপান্তর মাত্র, তন্ত্রের ধ্বংস হইলে তোমারই ধ্বংস হইয়া যায়। বিশ্বসংহারিনী হইয়া ও তন্ত্রের নিকটে তোমার সে সংহারশক্তি কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে,—তাই বলি মা! তোমার নিগমাগমের ত ধ্বংস হইবে না—একবার আমার নিগমাগমের ধ্বংস করিয়া দেও না! শক্তিরূপে শাক্তরূপে প্রকৃতিরূপে পুরুষরূপে বার বার আমার এই সংসারে যাতায়াত [নিগমাগম] ঘুচাইয়া দেও না!

(পক্ষান্তরে) মা! শক্তিরূপে শাক্তরূপে (প্রকৃতি এবং পুরুষরূপে) তুমিই জীবের নিগমাগমের (সংসারে যাতায়াতের) সৃষ্টিকর্ত্রী, প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জীব জন্ম গ্রহণ করে ইহা তোমারই বিধান। তুমিই শক্তি শাক্ত (মাতা পিতা) উভয় রূপে জীবের পালন কর। তাই জীবের নিগম আগম আশ্রয় সৃষ্টি পালন রক্ষা, শক্তি শাক্ত উভয় রূপে তোমা-কেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, মা! তুমি, যে শক্তি শাক্তে উভয় রূপে সংসার যাতায়াতের সৃষ্টি পালন রক্ষা করিতেছ—একবার দয়া করিয়া তোমার সেই শক্তি শাক্ত রূপে আমার সংসারের প্রলয়টি করিয়া দাও! নিখিল প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিতে শক্তি শিব—জ্ঞান দাও! এই বার আমি নয়ন ভরিয়া মন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া ভুবন ভরিয়া ভুবন মোহিনী মায়ের রূপ দেখিয়া লই—দশ দিগন্ত আলো করিয়া মা তুমি অনন্ত রূপে সাজিয়া দাঁড়াও, জন্মান্ধ সন্তানের চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনে উদ্ভাসিত করিয়া দাও,

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে দিকে চাই, যেন. মা! তোমার ঐ অপরূপে এ বিশ্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যাই—

মঙ্গলাচরণ।

মা! এ জগতে সকলেই কিছু না কিছু করিবার পূর্ব্বে যা হয় একটা মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে, আমি তাহার কি করিব? সর্ব্বমঙ্গলার চরণ ভিন্ন আর ত মঙ্গলাচরণ জানি না। তন্ত্রতত্ত্বে আমার যত যাহা করিবার আছে তাহা ত তুমি জান—অন্তর্যামিনি! যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে—কিন্তু আমি স্বতন্ত্র না হইলে ও স্বতন্ত্র থাকিতে চাই—তুমি, যেমন ব্রহ্মময়ী বিশ্বময়ী, তেমনি আবার, লীলাময়ী নৃত্যময়ী. যেমন আনন্দময়ী, তেমনি ইচ্ছাময়ী, চিন্ময়ী এবং মৃন্ময়ী; তাই বলি মা! তোমায় মনোময়ী নয়নময়ী প্রাণময়ী প্রেমময়ী দেখিতে চাই। যে শক্তিবলে তোমার নাম করিব, সে শক্তি স্বরূপিণী ও তুমি, তুমি আপন গান আপনি শুনিবে, আপন প্রেমে আপনি নাচিবে, আমার তাহাতে কিসের মঙ্গলাচরণ মা! তোমার অন্ন তোমায় ভোজন করাইব,—আমি—কেবল—প্রসাদ পাইব—তুমি আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনি তাহাতে বিভোর হইবে—আমি তোমার সেই স্তিমিত-গম্ভীর অদ্বৈত-সাগরে মা মা রবের দ্বৈত তরঙ্গ তুলিয়া সাঁতার দিব। বিরক্তি বোধ হয়, পদাঘাতে ডুবাইয়া দিও, তবুত মহাকালের বক্ষঃস্থল হইতে শ্রীচরণ উত্তোলন করিতে হইবে। তুমি হয় ত কোপকুঞ্চিত লোচনে চাহিয়া মহাকালকে বলিবে—"একে মার্"—আমি অমনি হাসিয়া করতালি দিয়া বলিব—"এ যে মার্!" চিক্কণ-শ্যাম-সুন্দরি! ঐ ভুবন-মোহন রূপের ছটায় সে কোপের ঘটা একবার দেখাও মা! তোমার ঐ স্মিত-শোভন-বদন-মণ্ডলে সে রোষারুণ করুণ-কটাক্ষ-ভঙ্গী দেখিতে বড়ই সাধ মা! সে সাধ না পূর্ণ হইলে সাধনা কেবল বেদনাময়ী, ভক্ত-ভয়-ভঞ্জিনি! ভবহৃদয়রঞ্জিনি! তোমার খেলা তুমি জান, ভয় দেখাও আর, হাঁসাও কাঁদাও, "মা" বলিতে শিখাইয়া দাও, মঙ্গলাচরণে হউক,

জয়মঙ্গলাচরণে হউক, নাচিয়া নাচিয়া " জয় মা " বলিয়া মঙ্গলা-চরণে শরণ লই।

জয় কুলেন্দ্র কুলানন্দ, কামদেব তার্কিক গুরুর জয়,।
জয় সশিষ্য কুলদানন্দ, নাথ পরমগুরুর জয়।
জয় জয় জয় কৃষ্ণানন্দ, পরাপর গুরুর জয়।
জয় পরমেষ্ঠি গুরু, বিজয়—ভৈরব-ভৈরবীর জয়।
জয় সিদ্ধ সাধকের জয়, জয় সিদ্ধিদা সাধিকার জয়,।
জয় যন্ত্র মন্ত্রের জয়, জয় তন্ত্র শাস্ত্রের জয়,।
জয় তন্ত্রবক্তার জয়, জয় তন্ত্রেশ্বরীর জয়,।
জয় সর্ব্বার্থ—সাধিকার জয়, জয় সর্ব্বমঙ্গলময়ীর জয়।
জয় জয় জয় " জগদম্বা, সর্ব্বমঙ্গলা " নামের জয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের আবির্ভাব ও উপযোগিতা।

(শাস্ত্রের প্রয়োজন)

সংসার তাহাকেই বলে, যাহাতে বহু ব্যক্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে এবং গার্হস্থ ধর্ম্মে তিনিই প্রসংশিত গৃহস্বামী, যিনি ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক পরিজনকে সমদৃষ্টিভাজন করিয়া স্নেহ ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। হয় ত সকলের প্রতি গৃহস্থের সমদৃষ্টি সমান স্নেহ আছে, কিন্তু পরিবারবর্গ মধ্যে কেহ যদি ন্যায় পথ অতিক্রম করিয়া কর্ত্তাকে পক্ষপাতী মনে করেন, তবে তাঁহার জন্যই শাসনের বিধান। মানবের ক্ষুদ্র রাজত্ব গৃহ মধ্যে ইহাই গৃহনীতি, এই নীতি আবার রাজত্বগত হইলে তাহারই নাম রাজনীতি; ফলতঃ বহু প্রকৃতির একত্র সামঞ্জস্য করিতে হইলেই রাজার এই শাস্তি সন্তোষময় ব্যবস্থা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। প্রজাপুঞ্জ তাহা বুঝিতে পারুন্ আর নাই পারুন্, রাজ্য রক্ষা করিতে হইলেই এই কঠোরমধুর রাজনীতিদণ্ড রাজাকে স্বহস্তে গ্রহন করিতে হইবে। কে এমন ভারতবর্ষবাসী আছেন, যিনি বর্ত্তমান রাজরাজেশ্বরীর একচ্ছত্রাধিপত্য সাম্রাজ্যের অন্তঃকক্ষে বাস করিয়া এ কথা অস্বীকার করিবেন।

এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংসারের রাজা তুমি আমি; তোমার আমার এই ক্ষুদ্র রাজত্বের সমষ্টি লইয়াই ভারতেশ্বরী আজ রাজরাজেশ্বরী, আবার এই অনন্ত কোটি বিশাল বিশ্বসংসার লইয়া যাঁহার রাজত্ব, ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্যে তিনিই এক অদ্বিতীয় অধীশ্বরী, ত্রৈলোক্য-রাজরাজেশ্বরী—তাঁহারই বিশ্ববিজয়ী অমোঘ শাসনের নাম শাস্ত্র। তুমি আমি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিরক্ষর মূর্খ প্রজা, বিশ্বসম্রাজ্ঞীর অনন্ত ভুবন রাজ্যের অগাধরাজনীতি তত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য তোমার আমার নাই, সামর্থ্য আছে কেবল, তাঁহার আজ্ঞা প্রতি পালন করিতে। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডলীলা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, যাঁহারা সেই মহাবিদ্যা-প্রসাদে ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে এই অবিদ্যা বিজৃম্ভিত দ্বৈততমঃ-পটল মধ্য দিয়া অদ্বৈত পরতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তুমি আমি কেবল তাঁহাদের পদাঙ্কলক্ষিত পথে অগ্রসর হইবার দায়িত্ব লইয়া সংসারে আসিয়াছি। রাজকীয় সভাসদগণ যেমন রাজনীতির প্রণেতা নহেন, কিন্তু বোদ্ধা তদ্রূপ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ও কেহ সাধনশাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, কিন্তু অনুস্মরণ কর্ত্তা। ইহা ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা-বিজড়িত সীমাবদ্ধ-মানববুদ্ধি-সিদ্ধ শাস্ত্র নহে. ভ্রম যাঁহার নিকটে ভ্রান্ত, প্রমাদ যাঁহার নিকটে প্রমত্ত, বিপ্রলিপ্সা যাঁহার নিকটে স্বতঃপ্রতারিত, সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ ভূতভাবন ইহার প্রকাশক, সর্ব্বান্তর্যামিনী ভগবতী জগদ্ধাত্রী ইহার শ্রোত্রী, পরে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ হইতে নারদাদি ঋষিকদম্ব এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র গৌতম প্রভৃতি গুরু পরম্পরা এ তত্ত্ব অধিগত হইয়া, তাঁহারাই এ বিশ্বরাজ্য-রাজসভার সভাসদ। তাঁহাদের প্রচারিত যাহা শাস্ত্ররূপ রাজনীতি, বিশ্বসাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী প্রজা তুমি আমি তাহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস। রাজার সান্নিধ্য লাভ করিয়া স্বচক্ষে রাজকার্য্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা যাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থানে না পৌছিয়া, তাঁহাদের জ্ঞানে অধিকার না পাইয়া তাঁহাদের নির্ণীত সেই সকল তত্ত্বে কূট-কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া হুংকারে

হিমাচল উড়াইতে যাওয়া, বুদ্ধিমানের পক্ষে হাসিবার, উন্মত্তের পক্ষে নাচিবার, আর, অবোধ অনার্য্যের পক্ষে অপমৃত্যু মরিবার কথা !!

(শাস্ত্র বোধ)

সেইখানে আমাকে লইয়া চল, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া পরীক্ষা করিব পদার্থ সত্য কি না " এ কথা তাঁহারই মুখে শোভা পায়, যাঁহার চক্ষু আছে, চরণ আছে, নাই কেবল পথের পরিচয়—আর আমার, না আছে চক্ষু, না আছে চরণ, না আছে পথের পরিচয়, আছে কেবল দানবপ্রকৃতি-সুলভ দুরন্ত অভিমান, যাহার আবেগে, আমার কিআছে, কি নাই, ইহা ও আমার দেখিবার অবসর নাই—তথাপি, কি জানি তাঁহার কেমন করুণা—পঙ্গু আমি, তথাপি জননী সেই দুরতিক্রম চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অতিক্রম করাইয়া জীবের এই স্বাধীনতার পূর্ণতম বিলাস-ভূমি ভারতক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যগোত্রে আমাকে পৌছাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুরদৃষ্টের কেমন কঠোর চক্র, যেমন জননীর অঞ্চলচ্যুত হইয়াছি, অম্‌নি স্বাধীনতার তরঙ্গভরে হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এখন, সাধের স্বাধীনতা—সাগরে যদি ডুবিয়া মরি, সেও স্বীকার, তথাপি স্বচক্ষে আপন মরণ না দেখিয়া কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে " আমি মরিতেছি "। আর, না মরিলেই বা কেমন করিয়া বুঝিব যে, " সে পথ আমার মন্দ, তোমার পথ ভাল ! " এই ত আমার পথপরিচয়ের পরিচয়, এমন মরণান্ত প্রতিজ্ঞায় যে অভিমানকে সেবা করিতে বসিয়াছে, নিত্যকৃপানিধান ঋষিগণ তাহাকেও প্রেম-মন্থর মধুর স্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয় মাবহন্তি" অর্থাৎ তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে না, অনুষ্ঠান করিয়া দেখ, চিকিৎসা জ্যোতিষ এবং তন্ত্র শাস্ত্র পদে পদে প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে। পরম দেবতার আশীর্ব্বাদে এবং শাস্ত্রের প্রসাদে পঙ্গু হইয়া ও আমি এইরূপে লক্ষ্য স্থলে পৌছিলাম, বিশ্বাস না করিয়া ও পথের পরিচয় পাইলাম তথাপি স্বভাব ঘুচিল না—চক্ষু ত নাই, কিউপায়েদেখিব ? কিরূপে পথের

পরীক্ষা করিব ? শাস্ত্র অমনি উঠিয়া বলিলেন "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" জীব। তুমি অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হইলে ও গুরুচরণে শরণাপন্ন হও, জ্ঞানরূপ অঞ্জনরঞ্জিত শলাকা দ্বারা তিনি তোমার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবেন। শাস্ত্র বলিলেন চক্ষুরুন্মীলিতং যেন—আমি শুনিলাম "চক্ষু রুন্মূলিতং যেন" এ ছুরদৃষ্টের খণ্ডন কিসে হইবে ? গুরুর নিকটে "বুঝি না" বলিতে অপমান হয়, এ অভিমানের উপায় কি ? তাই বলিতেছিলাম এ ছুরন্ত অভিমানের অন্ত না হইলে শান্তির ব্যবস্থা নাই। যদি নিজেই বুঝিয়া থাক, তবে ত গুরুকরণ নিষ্প্রয়োজন, যদি না বুঝিয়া থাক, তবে আর "বুঝি না" বলিতে অপমান বোধ কেন ? "আগে বুঝাইয়া দাও, পরে বিশ্বাস করিব" বলিয়া এ অনর্থক আব্দার্ কেন ? আর যদি এমন বুঝিয়াছ যে, নিজ বুদ্ধিবলে শাস্ত্রের ভ্রান্ত তত্ত্ব সকল খণ্ডন করিব, যুক্তিতর্ক বিচারের শানিত শরক্ষেপে খণ্ড খণ্ড করিয়া শাস্ত্রকে উড়াইব, তাহা হইলে ও ত অনেক দূর অগ্রসর হইবার কথা। এ শাস্ত্র, দর্শন বা বিজ্ঞান নহে—সিদ্ধি মূলক সাধননীতি। ইহা যেমন বুঝিতে হইবে, তেমনই সাধিতে হইবে, বোধের অভাবে সাধনের প্রভাবে ও ইহা প্রত্যক্ষ হইবে—কিন্তু সহস্র বোধ সত্ত্বে ও সাধনের অভাবে ইহা প্রত্যক্ষ হইবার নহে। ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়া ও অনুষ্ঠান বিরত হইলে সাধনারাজ্যে তিনি কীটানুকীট জীব বলিয়া ও গন্য নহেন—আবার মহামূর্খ ও যদি সাধনানুরক্ত বিশ্বাসী ভক্ত হয়, তবে শাস্ত্র তাহাকেই সহস্রের মধ্যে এক জন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে যেতামপি সহস্রেষু কোপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন, করে, যাহারা এইরূপ যত্ন করে, তাহাদের ও সহস্রের মধ্যে যদি কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জানে। তপোবীর না হইলে সাধন-সংগ্রামে বিজয় লাভ বুদ্ধিবীরের কার্য্য নহে। চতুরঙ্গ সেনাসম্পন্ন মহারথী ও যদি স্বয়ং নিরস্ত্র হয়েন, তবে তাঁহার সমস্ত উদ্যম যেমন ব্যর্থ

হয়, মহাধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ও তেমনি সাধনশক্তিহীন হইলে তাঁহার সমস্ত পাণ্ডিত্য ব্যর্থ হয়। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং, শরীরং বা পাতয়েয়ং" "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই প্রতিজ্ঞার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে যিনি ঝাঁপ দিয়াছেন ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদের ন্যায়, শাস্ত্র তাঁহাকেই অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন—আজ্ যদি তপঃসংগ্রামবীরেন্দ্রকেশরী কামদেব তার্কিকের মত, অনন্যশরণ মাতৃময়জীবন গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মত, শক্তিচরণ-সরোরুহ-মত্তমধুপ রামপ্রসাদের মত, বিশ্বাসের বল সকলের থাকিত—তবে কি আর তন্ত্রতত্ত্বে এ সকল কুমন্ত্রণার গান গাহিতে হইত? আজ্ সে দিন হারাইয়াছি—সাধন-শাস্ত্র তন্ত্রের প্রতি সে অটল বিশ্বাস টলিয়াছে!!!

শাস্ত্রে সন্দেহ।

"উপাসনা-শাস্ত্র বেদ ত রহিয়াছে, তবে আবার তন্ত্রশাস্ত্রের অবতারণা কেন হইল" ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী সমাজের প্রথম সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উত্তর আমরা পরে করিব। ততোধিক সন্দেহের বিষয় এই যে, যুগ যুগান্ত কঠোর তপস্যা করিয়া মানব যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহ, তন্ত্রশাস্ত্রে এক জন্মে এক বৎসরে এক সপ্তাহে সেই সিদ্ধি লাভ হইবে, আদৌ ইহা শুনিলেই উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। ঘোরপাপাচার-সঙ্কুল কলি-যুগের প্রতি ভগবানের এত দয়া কিসে হইল যে, ইন্দ্রাদিদেবদুর্লভ পদ এক জন্মে এক সপ্তাহে সিদ্ধ হইবে? যদি হয়, তবে ত ঈশ্বর ঘোর পক্ষপাতী, এই সকল কথা শুনিলে অনেক সময়ে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়—কেন না, তুমি আমি যেন ঈশ্বরের রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষক, তাঁহার রাজনীতির যশঃ অপযশঃ যেন তোমার আমার সমালোচনার প্রতি নির্ভর করে—আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি পক্ষপাতী হইলেন, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি কি? যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্ববিভু, তিনি পক্ষপাতী হইলে, তুমি আমি তাহা নিবারণ

করিব কি করিয়া ? বলিবে, আমরা নিন্দা করিব, তোমার আমার নিন্দায় তাঁহার আসে যায় কি ? যিনি কীটানুকীটের অন্তর্যামী, তুমি আমি নিন্দা করিব, তাহা কি তিনি জানেন না—জানিয়া শুনিয়া এ নিন্দা স্বীকার করিয়া যিনি " সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ " বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন "কলাবাগম মুল্লঙ্ঘ্য যোন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ " কলা বন্যোদিতৈ র্মার্গৈঃ সিদ্ধি মিচ্ছতি যোনরঃ। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ। নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ " " কলিযুগে আগমোক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য পথ গমনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার গতি নাই ইহা সত্য, সত্য, নিঃসংশয়। "

"কলিযুগে যে ব্যক্তি অন্যশাস্ত্রোক্ত নানা পথে সিদ্ধিলাভ ইচ্ছা করে, সেই দুর্ম্মতি পুরুষ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পানের জন্য জাহ্নবীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করে "

"ইহলোকে পরলোকে সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত এমন অন্য পথ নাই, যেমন তন্ত্রোক্ত পথ, সুখ মোক্ষ উভয়ের নিমিত্ত হইয়াছে। এই যাঁহার নিজ মুখনির্গত অভ্রান্ত মীমাংসা—তাঁহাকে তুমি নিন্দার ভয় দেখাইয়া কি করিবে ? যিনি নিন্দায় ভীত, স্তবে সন্তুষ্ট, তিনি তোমার ঈশ্বর হইতে পারেন কিন্তু জগতের ঈশ্বর নহেন, যিনি জগতের ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বর—লৌকিক যশঃ অপযশঃ, নিন্দা সাধুবাদ সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিশ্বকর্ত্তৃত্ব দণ্ডায়মান, ইহাই তাঁহার বৈকুণ্ঠ বৈভব—তোমার ইচ্ছা হয়, নিন্দা কর, তিরস্কার কর, হিমাচল পর্ব্বতের মূলে কঠোর মুষ্টি নিঃক্ষেপ কর—অটল অচলরাজ তাহাতে টলিবেন না—কিন্তু তোমার অঙ্গুলী গুলি চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া যাইবে। ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া যাঁহারা তাহার ফল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে নিরস্ত হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা নিজের ন্যায় লইয়া ঈশ্বরকে ন্যায়পরায়ণ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবার নহেন, আমরাও বৈষম্যবাদী বা তাহা-

দের মতের বিরোধী নই, কিন্তু এই বলি যে, কলির জীবের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ভঙ্গ হয় নাই, বরং এ দয়া না করিলেই অন্যায় হইত। জিজ্ঞাসা করি—সত্যযুগের লোকসকলকে লক্ষ বৎসর পরমায়ুঃ এবং মজ্জাগত প্রাণ দিয়া, কলির মনুষ্যের শত বৎসর পরমায়ুঃ এবং অন্নগত প্রাণ দেওয়া ঈশ্বরের কোন্ ন্যায়পরায়ণতার কার্য্য হইয়াছে? এক বার যখন অন্যায় হইয়াছে, তখন "একেন পাপঞ্চ শতেন কিম্বা" না হয়, আর এক বার অন্যায় হইল, তাহা বলিয়া কি করিবে? বাস্তবিক কিন্তু "বিষস্য বিষমৌষধং" কলিযুগ অপেক্ষায় সত্যযুগে পরমায়ুঃ সম্বন্ধে ন্যায়ের যে অভাব ঘটিয়াছিল, সত্য যুগ অপেক্ষায় কলিযুগে সাধনের ফল শীঘ্র দিয়া, তিনি না হয় সেই অভাব পূরণ করিলেন, তাহাতে তোমার আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ফলতঃ তাঁহার অভাব ও নাই—পূরণও নাই। নটনাট্যবৎ সংসার নাটকে তিনি নটরাজ এবং নটবর-রমনী। সর্ব্বাগ্রে নটনটীর সম্মিলনে এ নাটকের প্রারম্ভ, আবার তাঁহাদের ই অমোঘ ইচ্ছাক্রমে কাল যামিনীর অবসানে ইহার উপসংহার। সংস্কৃত—নাটকতত্ত্ববিদ্‌গণ অবগত আছেন, গোপুচ্ছসদৃশাকারে নাটকের বন্ধনরচনা হয়, জানি না—আলঙ্কারিককবিগণ কোন প্রমাণ অনুসারে এ রচনা প্রণালীর আবিষ্কার করিলেন; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ত আমাদের বোধ হয় যেন আদিকবি বিশ্বরচয়িতার আদর্শনাটক দেখিয়া ই নাটকবন্ধনে এ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। সেই আদর্শরচনা-বিশ্বনাটকের এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগের বিন্যাস দেখিয়া বোধ হয়, লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে এই কলির উপান্ত কাল পর্য্যন্ত যেন গোপুচ্ছ সদৃশাকারে রচিত হইয়াছে। লীলা সম্বরণের সময় হইয়া আসিয়াছে, অমনি যেন—উপাদান উপকরণ গুলি শীঘ্র শীঘ্র সংযত করিয়া সংসারের শেষ দৃশ্য ভস্মস্তোম-বিভূষিত মহাশ্মশানে নটরাজ মহাকাল একবার মহাপ্রলয়ের বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করিবেন এবং তাঁহার ই বক্ষঃস্থলে দক্ষিণচরণ অর্পণ করিয়া নটবররমনী মহাকাল-মোহিনী জননী আবার

চিদ্ঘণানন্দ প্রেমতরঙ্গে বিভোর হইয়া অশ্রান্ত নৃত্যভরে উন্মাদিনী সাজিবেন—কলিযুগের শীঘ্র শীঘ্র উপান্ত-সংহার কেবল সেই নৃত্যের সাজ সজ্জা বই আর কিছুই নহে। অবিশ্বাসী অভক্তের প্রাণ এ দৃশ্য স্মরণ করিয়া সভয়ে কম্পিত হইতে পারে কিন্তু ভক্তহৃদয়ে এ আনন্দবার্ত্তা পুলকে প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত করে—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, কাহার সাধ্য তাহা নিরোধ করে।

দ্বিতীয়তঃ, সত্যযুগের জীব অপেক্ষা কলিযুগের জীবের প্রতি তাঁহার অপার করুণার উল্লেখ দেখিয়া যখন তোমার ঈর্ষা হয়, তখন বোধ হয় যেন, তোমার মতে সত্যের জীব, কলির জীব, বলিয়া কতগুলি জীবের সংখ্যা গণ্ডী দেওয়া আছে—দুই দলে যেন দলাদলি, কেহ কাহার ও বাটীতে যায় না। সত্যর জীব কলিতে আসিবে না, এবং কলির জীব সত্যে যাইবে না, না যাউক, না আসুক, তাহাতে ক্ষতি নাই—এখন জিজ্ঞাসা করি—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের জীব, সকলে ই কিছু, সিদ্ধপুরুষ নহে, আর, কলির জীব বলিতে, সকলে ই একে বারে অসিদ্ধ নহে, এ কথা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ। তবে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যাঁহারা সাধক, অথচ সিদ্ধ নহেন, এবং কলিতে যাঁহারা সাধনোন্মুখ অথচ সাধক নহেন, সে সকল জীবের গতি কি হইবে ? তোমার মতে ত কলির জীব সত্যে যাইবে না এবং সত্যের জীব কলিতে আসিতে পারিবে না—সত্য ও কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে, হয় তাহারা পরব্রহ্মে লীন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিল, না হয় একেবারে অনন্তনরকে ডুবিল—ধন্য তোমার ন্যায় পরায়ণতার বিচার, বলিহারি তোমার অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত !!! কলির জীব এক জন্মে সিদ্ধ হইবে শুনিয়া তুমি চমকিয়া উঠিয়াছিলে, এখন তোমার সত্যের জীব যে, সাধন আরম্ভ করিতে ই নির্ব্বাণ মুক্তি পায়—হয় ত এক জন সত্য যুগের এক কোটি বৎসর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি পাইয়াছেন—সৌভাগ্যক্রমে সত্যযুগের শেষে যিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন—তিনি বিনা পরিশ্রমে (যুগান্তের অনুরোধে) সেই জন্মে ই সেই সিদ্ধি লাভ করি-

লেন--ন্যায়বাদিন্ ! বলিয়া দাও! তোমার এ কোন্ ন্যায়ের নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচার !

চতুরশীতিলক্ষ বারে যে ন্যায়ের চক্র একবার বিঘূর্ণিত হয়, তোমার আমার ঊর্দ্ধসংখ্যা শত বৎসরের ন্যায় লইয়া তাহার সহিত বিচার হয় না, শাস্ত্র বলিতেছেন—

বিশ্বসার তন্ত্রে ।

১

" মানুষ্যসদৃশং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে
দেবতাঃ পিতরঃ সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম মানুষং ।
দুর্লভো মানুষো দেহঃ সর্ব্বদেহেষু সর্ব্বদা
তস্মাচ্চ মানুষং জন্ম এতদুক্তং সুদুর্লভং ।
তত্রাপি সংশয়চ্ছেত্তা বিশেষেন তু পার্ব্বতি
মন্ত্রতন্ত্ররতঃ পুংসাং সোপি চেদতিদুর্লভঃ ।
তত্রাগমবিদঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বদেহেষু পূজিতাঃ
তত্রাপি সাধকঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ "

রুদ্রজামল তন্ত্রে—

২

মানুষ্যং সফলং জন্ম সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোচরং
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিনাং ।
ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে
কদাচিল্লভতে জন্ম মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ।
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং জন্ম দুর্লভং ॥

নির্ব্বাণ তন্ত্রে ।

৩

স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্মচাপ্নোতি সোব্যয়ঃ

ততো লভেৎ পরেশানি মানুষীং দুর্লভাং তনূং ॥

কর্ম্মবিপাকে—

৪

স্থাবরা স্ত্রিংশলক্ষশ্চ জলজো নবলক্ষকঃ
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চত্তর্লক্ষশ্চ মানবাঃ
এতেষু ভ্রমনং কৃত্বা দ্বিজত্ব মুপজায়তে ॥

নির্ব্বাণতন্ত্রে—

৫

ততো মানুষদেহশ্চ ততো ধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ
ততোপি লভতে জন্ম পুনর্ম্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ
জায়ন্তেচ ম্রিয়ন্তেচ কর্ম্মপাশনিযন্ত্রিতাঃ
চতুরশীতিলক্ষেষু নানাযোনিষু শৈলজে ॥
যমাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযযৌ ব্রহ্মশাসনং ।
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদিস্যাদ্দুর্লভাতনুঃ
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাদ্ যদি প্রাপ্নোতি সদ্গুরোঃ ।
তত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ
তদৈব পরমো মোক্ষো যাবদ্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং ।
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি ।

১

মনুষ্যজন্ম—সদৃশ জন্ম কুত্রাপি নাই, দেবতা এবং পিতৃলোক সকল এই মনুষ্য জন্ম বাঞ্ছা করেন। দেহীর সমস্ত দেহ অপেক্ষা মনুষ্য দেহ সর্ব্বদা দুর্লভ, এই জন্য মনুষ্য-জন্ম সুদুর্লভ বলিয়া কথিত হইয়াছে, পার্ব্বতি! এই দুর্লভজন্মা মানব মধ্যে সংশয়চ্ছেত্তা ব্যক্তি বিশেষ দুর্লভ, সংশয়চ্ছেত্তাগণের মধ্যে মন্ত্রতন্ত্ররত পুরুষ অতিদুর্লভ; সেই মন্ত্রতন্ত্ররত ধার্ম্মিক গণের মধ্যে আবার সর্ব্বদেহি-পূজিত তন্ত্রবিদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ,

তাঁহাদিগের মধ্যে আবার যিনি সাধক তিনি ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বতন্ত্রে নিগূঢ়।

২

শরীরীর চতুরশীতিলক্ষ শরীর মধ্যে মনুষ্য জন্মই সফল, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত। মনুষ্যত্ব ব্যতিরেকে জীব অন্য জন্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে কদাচিৎ, মোক্ষমার্গের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়।

৩

শৈলজে! অব্যয় জীবাত্মা স্থাবর কীট পশু পক্ষি প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ জন্ম প্রাপ্ত হয়, পরমেশানি। তৎপরে দুর্লভা মানুষী তনু লাভ করে।

৪

ত্রিংশলক্ষ স্থাবর, নবলক্ষ জলজ, দশলক্ষ কৃমিজ, একাদশলক্ষ পক্ষী বিংশলক্ষ পশু, চতুর্লক্ষ মানব এই চতুরশীতি লক্ষ জন্ম ভ্রমন করিয়া তবে জীব দ্বিজত্ব লাভ করে।

৫

তৎপরে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে, তৎপরে ধর্ম্মাধিপতি হয়, তৎপর পুনর্ব্বার জন্ম লাভ করে, পুনর্ব্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপে জীব কর্ম্মপাশনিযন্ত্রিত হইয়া চতুরশীতিলক্ষরূপ নানাযোনিতে জাত এবং মৃত হয়।

যমের আজ্ঞাক্রমে জীব ব্রহ্মলোকে গমন করে, তথা হইতে কর্ম্মানু-সারে দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া সৌভাগ্যক্রমে যদি সদ্গুরু হইতে মহাবিদ্যার "মন্ত্র দীক্ষা" এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে—তবে ই জীবের পরম মোক্ষ, যত কাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের স্থায়িত্ব, মহাবিদ্যার প্রসাদে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ জন্মে জীব নিজকর্ম্মানুরূপ পরমায়ু ভোগ করে, কাহার ও শতবৎ-

সর, কাহারও সহস্র বৎসর, কাহার ও লক্ষ বৎসর, কাহার ও বা ততো-
ধিক কোটি কোটি বৎসর—ইহার ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সমস্ত জীব, পূর্ণ,
অপূর্ণ, পূর্ণাপূর্ণ, ভুক্ত, অভুক্ত, ভুক্তাভুক্ত নানাবিধ অদৃষ্ট সত্ত্বে ই কেবল
এক যুগান্তের অনুরোধে চরমসমাধি লাভ করে ইহা কোন্ শাস্ত্রের
কোন্ প্রমান অনুসারে তোমার [মানুষের] বুদ্ধিতে স্থান পায়, তাহা
ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শেষের এক কথা আছে যে. " চতুরশীতি
লক্ষ জন্ম বিশ্বাস করি না " এ কথা ও তোমার মুখে শোভা পায় না-
কেন না, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্যুগ যে প্রমাণে যে
কারণে যে যুক্তিতে বিশ্বাস কর, অন্ততঃ সেই প্রমাণে সেই কারণে সেই
যুক্তিতে ই চতুরশীতি লক্ষ জন্ম বিশ্বাস করিতে তুমি অবশ্য বাধ্য, কারণ,
উভয় ই শাস্ত্রের নির্দেশ। শাস্ত্রের একাংশ বিশ্বাস করি, অপরাংশ ভ্রান্ত—
মানুষ দক্ষিণাঙ্গে সচেতন. বামাঙ্গে অচেতন. এ কথা যে বিশ্বাস করে,
তাহাকে বিশ্বাস করিবে কে, তাহা জানি না। একটা স্থূল কথা জিজ্ঞাসা
করি—বিশ্বাস করিবে না কেন ? অবিশ্বাসের কারণ কি হইয়াছে ?
তুমি বলিবে, এই চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যা ই অবিশ্বাসের কারণ—কেন না,
এ চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অপ্রত্যক্ষ ; আমি কিন্তু বলিব, যে চতুরশীতি লক্ষ
সংখ্যা তোমার অবিশ্বাসের কারণ—সেই চতুরশীতিলক্ষ সংখ্যাই আমার
ধ্রুব বিশ্বাসের কারণ। কেন না, এই চতুরশীতি লক্ষ জন্ম তোমার আমার
অপ্রত্যক্ষ—যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা নাই বলিবার তুমি কে ? তুমি ঊর্দ্ধ সংখ্যা
বলিতে পার, আছে কি না তাহা জানি না—দেখি নাই বলিয়া আমি
যেমন " আছে " বলিতে পারি না, দেখ নাই বলিয়া তুমি ও তেমনি
তাহা নাই বলিতে পার না। আর—আমি দেখি নাই বলিয়া ই যদি "নাই"
হয়, তবেত, অন্ধের পক্ষে জগৎ ও নাই, সে ত নিজকে ও নিজে দেখিতে পায়
না—তবে কি তাহার পক্ষে সে ও নাই ? নাই তাহাতে ক্ষতি নাই, জিজ্ঞাসা
করি, তবে এ "নাই" বলে কে ? যে নিজে নাই, তার বলা ও নাই ! !
যে কারণে পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, সেই কারণ—সজ্যটনসময়ে মানব

ত শুক্রশোনিত-পরমাণুগত, সে ঘটনা ত তাহার প্রত্যক্ষ নহে, তবে না দেখিয়া পরের কথায় "পিতা মাতা" বিশ্বাস কর কেন? হইতে পারে ইষ্টাপত্তি—বলিবে, তাহা ও বিশ্বাস করি না—এ অবিশ্বাসের কারণ কদাচিৎ সত্য হইতে ও পারে,কিন্তু তাই বলিয়া কি, তুমি মানুষ হইয়া সাহস করিয়া বলিতে পার? জগতের সকল পিতা মাতা ই এই রূপ সন্দেহের বিষয়! বলিতে পারিলে ও তাহা উন্মত্তপ্রলাপ বই আর কিছুই নহে। চতুরশীতিলক্ষজন্ম—সম্বন্ধে ও যদি তোমার সেইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু বলি এই যে—সন্দেহকে সন্দেহ বলিয়া স্থির রাখিও, নিশ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না, কেন না "আছে কি না" ইহাই সন্দেহ; অস্তিত্ব নাস্তিত্ব এই উভয়কোটি-বিশিষ্ট জ্ঞান না হইলে সন্দেহ হয় না। যাহা "নাই" বলিয়া জানিয়াছ, তাহা কখন ও "আছে কি না" হইতে পারে না। "নাই" ইহা সন্দেহ নহে, নিশ্চয়। তাই বলিতেছিলাম সন্দেহ যখন হইয়াছে, তখন বলিতে পার—চতুরশীতি লক্ষ জন্ম আছে কি না জানি না। এই "আছে কি না" সন্দেহ বশতঃ একেবারে "নাই" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্তির বিভীষিকা মাত্র। আমরা জন্মান্তরবাদে এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অগ্রসর হইব, এক্ষণে এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যা যখন নির্দ্দিষ্ট আছে, তখন, বিশ্বাস করা ই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কেহ আংশিক, কেহ অসম্পূর্ণ, কেহ ইঙ্গিতে, কেহ ভঙ্গীতে, যিনি যেরূপে ই কেন, জন্মান্তর স্বীকার না করুন—বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগে, যে দেশের যে পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহার কোন্ দেশের, কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, কোন্ ধর্ম্ম গ্রন্থে, চতুরশীতি লক্ষ জন্মের নাম শুনিতে পাও! কি চার্ব্বাক দর্শন, কি কোরাণ, কি বাইবেল,-কাহার সাধ্য যে, মস্তক উন্নত করিয়া বলিতে পারে "জীবের জন্ম শতুরশীতি লক্ষ প্রকার" কাহার এমন ব্রহ্মাণ্ডবিস্ফারিণী দৃষ্টি যে, ভূ ভুবঃ স্বঃ মহ জন তপঃ সত্য অতল বিতল সুতল তলাতল রসাতল মহাতল পাতাল এই চতুর্দশ

ভুবনের অণু পরমাণু ভেদ করিয়া প্রতিজীবের প্রকৃতিপরিচয় গ্রহন করিয়া "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ" এই কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া অভ্রান্তরূপে তর্জনী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতে পারে যে, জীবের জন্ম চতুরশীতি লক্ষ। দেখাইয়া দেওয়া দূরে থাক্, কেহ কি সাহস করিয়া বলিতেও পারে যে, জীবের সংখ্যা চতুরশীতি লক্ষ। স্মৃতিপট—পরিবর্ত্তনে প্রতি জন্মে যে জীব, প্রতি জন্ম বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার সেই উন্মেষ-নিমেষ-বশবর্ত্তিনী বুদ্ধির সাধ্য নহে যে, দর্শনে বিজ্ঞানে অনুভবে অনুমানে নিশ্চয় করিয়া বলিবে—জন্ম সংখ্যা চতুরশীতি লক্ষ। কেবল বলিতে পারে সেই ধর্ম্ম,সেই শাস্ত্র,যে ধর্ম্ম এবং যে শাস্ত্র—সেই নিখিল জীবের অন্তর্যামিনী নিত্যচৈতন্যরূপিনীর ইচ্ছাময় হৃদয়ে আবির্ভূত এবং নিশ্বাসে অভিব্যক্ত। এ বিশ্বভাণ্ড যাঁহার চরণতলে নিত্যক্রীড়ার আনন্দকন্দুক, সেই আনন্দ-ময়ীর নিজমুখনির্গত শাস্ত্র ভিন্ন কাহার সাধ্য যে, জীবজন্মের ইয়ত্তা করিবে ? " চতুরশীতি লক্ষ জন্ম " এ কথা সাহস করিয়া সেই শাস্ত্র বলিতে পারে, যে শাস্ত্র, পলকে পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা দেখিয়া পুলকভরে নাচিতে থাকে, অন্য শাস্ত্র স্তম্ভিত হয় হউক, তাহা দেখিয়া তোমার আমার মূর্চ্ছিত হইবার প্রয়োজন নাই। এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখ যে, যে, সহস্র সংখ্যা গণিতে পারে, সে সহস্র সংখ্যার অঙ্কসঙ্কেত অবশ্য জানিয়াছে, তদ্রূপ, চতুরশীতি লক্ষ সংখ্যা যে বলিতে পারে, সে, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম অবশ্য দেখিয়াছে ! !

শাস্ত্রে যুক্তি—

তুমি হয় ত শুনিয়াছ, " যুক্তিযুক্ত মুপাদীত বচনং বালকাদপি " আর শুনিয়াছ " যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে " কিন্তু সে যুক্তির বিষয় কি এবং সে যুক্তি কোন্ যুক্তি, তাহা হয় ত বুঝিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। যে যুক্তির দ্বারা তোমাকে বিচার করিতে শাস্ত্র বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে—সে তোমার বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত, এবং বিচা-রের অনুকূল ব্যাবহারিক শাস্ত্রের যুক্তি। পারমার্থিক শাস্ত্র, যাহার সাধনা

করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইবে, যে শাস্ত্রের সাধন-সিদ্ধ বুদ্ধি, তোমার অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, লৌকিক যুক্তির দ্বারা সে অলৌকিক শাস্ত্রীয় তত্ত্বের তুমি কি উপপত্তি করিবে ? বুদ্ধি আছে বলিয়া দুঃখিত হইও না, বুদ্ধি সত্ত্বে, বিচার করিতে পারিলে না, বলিয়া অপমান বোধ করিও না—বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু কোন বুদ্ধি, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি নাই এই টুকু ই দুঃখ—কলিকাতা হইতে বাঙ্গলা তালার চাবি কিনিয়াছ, সুখের কথা, কিন্তু সেই চাবি দিয়া পঞ্জাবী তালা খুলিতে যাও, ঐ টুকু ই ত দুঃখ—তুমি অপমান বোধ করিয়া দুঃখিত হইতে পার, তালা ত খুলিবে না—বেশী পীড়াপীড়ি কর, চাবিটি ভাঙ্গিয়া যাইবে, লাভে মূলে বাঙ্লা তালাটি পর্য্যন্ত বদ্ধ হইবে—তাই বলিতেছিলাম, লৌকিক যুক্তির চাবি দিয়া পারমার্থিক তত্ত্বের তালা খুলিতে যাও—স্বাভাবিক বুদ্ধি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতো ভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ হইতে হইবে, এই জন্য শাস্ত্র ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথার দিব্য দিয়া সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ” অর্থাৎ যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত, তাহা তর্কে যোজনা করিবে না। তুমি আমি তর্ক করিয়া বিচার করিয়া যাহার মীমাংসা করিতে পারি—তাহার জন্য আর শাস্ত্র কেন ? শাস্ত্র তাহার ই নাম, যাহা তোমার আমার অতীন্দ্রিয় অনধিগত অচিন্তিত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের বিধান কর্ত্তা, প্রত্যক্ষ যেখানে অন্ধ, অনুমান যেখানে পঙ্গু, সেই স্থানেই শাস্ত্রের একাধিপত্য। অগাধসমুদ্র-মধ্যচারী জলজন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করিবে, “চক্ষু আছে” বলিয়া তোমার আমার তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার নাই—সে রাজ্যের দৃষ্টি স্বতন্ত্র, চক্ষু থাকিতে ও তুমি আমি তথাতে অন্ধ !! তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রমধ্যমগ্ন অগাধতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার তোমার আমার নাই। বিচার স্থলে অনেক বলিয়া থাকেন —“যাঁহারা নিজ মনঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত পরমাত্মায় বিলীন করিয়া নির্ব্বিকল্পসমাধি-যোগে অভীষ্ট দেবতার চরণচিন্তায় নিরন্তর নিরত

থাকিতেন, তাঁহারা আবার চতুর্দ্দশভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনুপরমানুগত বস্তুতত্ত্ব সকল দেখিবার সময় পাইতেন কখন ? অদ্বৈত-তত্ত্বে দ্বৈতসত্তার ভান পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া যায়, এ অবস্থায় আবার যোগী ঋষি মুনিগণ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার অবসর পাইতেন কিরূপে? ব্রহ্মাণ্ড না ভুলিলে ব্রহ্মদর্শন হয় না, আবার ব্রহ্ম না ভুলিলেও ব্রহ্মাণ্ডদর্শন হয় না, এই পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একত্র সামঞ্জস্য অসম্ভব” এ কথা আমরা ও অস্বীকার করি না, যদি ও এ স্থানে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার অবসর নহে, তথাপি সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি— কবিগণ বলিয়াছেন “ মুক্তাহি জবয়ারক্তা ন শুভ্রা মুক্তয়া জবা ” একটি মুক্তা এবং একটি জবাপুষ্প একত্র রাখিলে জবার রক্তিমচ্ছটায় মুক্তা আরক্ত হয়, কিন্তু মুক্তার বিশদ প্রভায় জবা শুভ্র হয় না, কেন না, মুক্তা নির্ম্মল এবং জবা মলিন ; যে পদার্থ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ সে পরের প্রতিবিম্ব গ্রহন করে, যে মলিন, সে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্ব গ্রহন করিতে পারে না—যেমন, দর্পনে আমরা মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহন করি, কিন্তু মুখে দর্পনের প্রতিবিম্ব পাই না, কেন না দর্পন নির্ম্মল, মুখ মলিন ; মায়ামলীমস ব্রহ্মাণ্ড ও তেমনি সকল পদার্থ ই মলিন, নির্ম্মল কেবল সেই মায়ার অতীত এক মাত্র ব্রহ্ম। মলিন ব্রহ্মাণ্ড, নির্ম্মল ব্রহ্মের প্রতি-বিম্ব গ্রহন করিতে পারে না, কিন্তু নির্ম্মল ব্রহ্মে মলিনব্রহ্মাণ্ড স্বতঃ প্রতিবিম্বিত হয়। আমরা পুষ্করিণী বা নদীর তীরে স্থলবিভাগে দৃষ্টি ক্ষেপ করিলে শ্যামল ভূমি ও বনবিন্যাস বই জলরাশি দেখিতে পাই না, আবার তীর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যেমন নীরে নিক্ষেপ করি, অমনি তাহার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই, বৃক্ষের কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব ফল পুষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মূল অবধি শ্যামলভূমিপর্য্যন্ত সন্নিবেশ, আবার ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ততারকাস্তবক-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের সেই প্রকাণ্ড কক্ষ পর্য্যন্ত সরোবরের অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু স্থলে যাহা ঊর্দ্ধমুখ, জলে তাহা ই অধোমুখ, আবার স্থলে যাহা

অধোমুখ, জলে তাহা ই ঊর্দ্ধমুখ। যাঁহারা তত্ত্বসাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহাদের ও দৃশ্য এই—আমরা সরোবরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিলে ও যেমন জলের দিকে চাহিলে ই আকাশের কক্ষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারি—ঋষিগণ ও তদ্রূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি না চাহিয়া, চাহিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতি, দেখিয়াছিলেন তাঁহার ই সেই চিদঘনানন্দ—কলেবরে, প্রতিরোমকূপবিবরে অনন্তকোটি জগৎ জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতি নিমেষে একবার উদ্ভিন্ন একবার বিলীন হইয়া যাইতেছে—পথ শ্রান্তি ভোগ করিতে হয় নাই, পরমায়ুঃ ক্ষয় করিতে হয় নাই, দুর্লঙ্ঘ্য ভুবনাঙ্গন উল্লঙ্ঘন করিতে হয় নাই—কারণশরীরে ও জীব যে তত্ত্ব অধিগত হইতে পারে না, সাধকগণ, সাধন-ভবনে ধ্যানশয়নে জ্ঞান-নয়নে ই ত্রিভুবনের সে সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন দেখিয়াছেন—সমাধিভঙ্গে ও তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তবে, বিশেষ এই যে—তুমি আমি জড় জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববেত্তা যাহা কিছু দেখি, তাহাই উন্নত, তাহা ই ঊর্দ্ধমুখ—আমরা যাহা দেখি, ভাবি,—ইহা অপেক্ষা উচ্চ বুঝি সংসারে আর কিছু ই নাই—কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়াছেন, ভগবতীর উদরে কারণসমুদ্রের রুধির-তরঙ্গে যাহা কিছু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—এ সংসারে তাহার যাহা উন্নত, ব্রহ্মময়ীর চরণতলে তাহা ই অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আবার যাহা সংসারে চিরকাল অবনত মুখে ছিল, সে আজ মায়ের নিকটে গিয়া, কি জানি মায়ের কি সোহাগ পাইয়া আনন্দে মস্তক উন্নত করিয়া আনন্দময়ীর ব্রহ্মরূপ দেখিতেছে—একই পদার্থ রহিয়াছে, কিন্তু স্থলে যাহা দেখিলাম, আধারভেদে জলে আবার তাহা ই বিপরীত। তাই বলিতেছিলাম-ব্রহ্মাণ্ড পদার্থ এক হইয়া ও আধার ভেদে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডই দেখেন, তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মাণ্ড হইতে উচ্চ পদার্থ আর কি আছে? কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন, তাঁহারা ই দেখিয়াছেন—ধ্রুবলোক চন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অভ্রভেদী সুমেরু শিখর পর্য্যন্ত, তোমার ব্রহ্মাণ্ডের যত উচ্চ

পদার্থ.—সে সকলকে স্তরে স্তরে সিংহাসন সাজাইয়া রাজরাজেশ্বরী ব্রহ্মময়ী তাহার উপরে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্ববিস্ময়—বিস্ফারিণী শক্তিলীলার সেই বিরাট তত্ত্ব দেখিয়া দেবগণ ঋষিগণ ধরাতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া বলিয়াছেন, " চিতিরূপেন যা কৃৎস্ন মেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ "। চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া যিনি অবস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। তন্ত্রে—যানপাষাণধাতূনাং তেজোরূপেন সংস্থিতা। জীবজন্তুষু দেবেশি কিং বক্তব্য মতঃ পরং। যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্নবিদ্যতে। জড়, যান পাষাণ ধাতু ইত্যাদিতে ও যিনি তেজোরূপে অবস্থিতা, দেবেশি! জীব জন্তু শরীরে তিনি অবস্থিত কি না, তাহা আর কি বলিব? এমন স্থান জগতে নাই, যে স্থানে মহামায়ার সত্তা নাই। মানব! আজ তাঁহাদের সেই দৈবী দৃষ্টি, আর তোমার আমার এই জৈবী দৃষ্টি,এক হইবার আশা করিব কোন সাহসে? শাস্ত্র বলিয়াছেন-বিশ্ববীচিবিলাসোয়ং চিৎসুধাব্ধে স্ফুরত্যতি" এ বিশ্ববিলাস কেবল সেই চৈতন্যসাগরের তরঙ্গলীলা বই আর কিছুই নহে, যাঁহারা সমুদ্র দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, তরঙ্গ দর্শনের জন্য যেমন তাঁহা দিগকে আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ, যাঁহারা ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের জন্য আর তাঁহা-দিগকে স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হয় নাই, দূরবীক্ষণ বা স্থলযান জলযান ব্যোমযানের সাহায্যে তাঁহাদের বিশ্বদর্শন হয় নাই; বিশ্বেশ্বরীকে দর্শন করিতে গিয়াই তাঁহারা, তাঁহার চরণাশ্রিত বিশ্বতত্ত্ব দেখিয়াছেন। আজ্ কাল্ যাঁহারা ভূততত্ত্ব বিচার করিয়া বিজ্ঞানবিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগের দর্শনে আর ঋষিগণের দর্শনে প্রভেদ এই যে—ইহাঁরা ক্ষুদ্র জীবনে,ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিয়দংশ দর্শন করিয়াই ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন—কি জানি ইহার পরে কি আছে, যাহা ই হউক এ লীলা দেখিয়া যাঁহার লীলা, তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব বিচিত্র ইহা বই আর কিছু অনুভব হয় না, এবং তাঁহার সেই বিচিত্র শক্তির পরিচয় জানিতে হইলে, বিশ্বতত্ত্ব

সন্দর্শন অপেক্ষা উচ্চতর উপায় মানবজীবনে আর কিছু ই নাই। এই স্থানে ই ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, নিত্যনবলীলাময়ীর পক্ষে এ লীলা, কিছু ই বিচিত্র নহে—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার যাঁহার এক কটাক্ষের প্রতি নির্ভর করে—একটি জগতের অনু পরমানুগত লীলা-বিজৃম্ভন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন গণনীয় ঘটনার মধ্যে ই নহে। এই পূর্ণলীলার প্রসবভূমি সেই অনাদ্যা আদ্যাশক্তিকে যে দেখিয়াছে—বিশ্ব দৃশ্য তাহার চক্ষে বিস্ময়কর নহে—তাই ঋষিগণ, নটনাট্যবিলাস সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সেই নিখিল-নটনাটয়িত্রী বিশ্বসূত্রধাত্রীর অগাধ তত্ত্ব-সাগরে ডুবিয়াছেন—দেখিয়া শুনিয়া সিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধ হস্তে ডাকিয়া বলিয়াছেন—জগতের সৌন্দর্য্য বৈচিত্র দেখিয়া মনঃ প্রাণ বিমুগ্ধ করিও না—এ আনন্দ মোহ চিরদিন রহিবে না, যদি শান্তির আশা কর, তবে ঐ আনন্দময়ীর, সদানন্দ হৃদ্বিহারি তাপত্রয়হারি চারুচরণসরোরুহে মনঃ প্রাণ সমর্পন কর—দেখিবে, চরণাম্বুজের দলে দলে, কিঞ্জল্কে কিঞ্জল্কে পরাগে পরাগে, চৈতন্যরাগরঞ্জিত কত কোটি অনন্তভুবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার ঐ কমলেরই প্রেম-মকরন্দে ডুবিয়া ডুবিয়া বিলীন হইতেছে।

কথা গুলি সত্য হইলে ও শুনিতে যেন কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের আনন্দ শোক উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মানন্দে ডুবিতে হইবে, সে ত পরের কথা, আপাততঃ এ কথা যে বলে তাঁহাকে ই যেন অসাম্প্রদায়িক অরসিক বলিয়া বোধ হয়, পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধরিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া যে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, তাহার নিকটে বসিয়া যদি কেহ রঙ্গরসের গল্প করে, অথবা বিবাহযাত্রায় সুসজ্জিত আনন্দোৎফুল্ল যুবাকে কেহ যদি শবসৎকারের জন্য অনুরোধ করে—তবে তাহা যেমন অসঙ্গত এবং অসহ্য, প্রত্যক্ষ দৃশ্য সংসারকে উপেক্ষা করিয়া অপ্রত্যক্ষতত্ত্বের অন্বেষণে ধাবিত হওয়ার এ উপদেশও তেমনি অসঙ্গত এবং অসহ্য। এই অসহ্যতা-নিবন্ধন তুমি আমি উপদেষ্টাকে উন্মত্ত মনে করিতে পারি, কিন্তু

উপদেষ্টা তাহাতেও ক্ষন্ত হইবার নহেন। মনে কর—তুমি আমি, অভিনয় পদার্থ কি, তাহা না জানিয়া, রামায়ণের অভিনয় দেখিতে বসিয়াছি—কৌশল্যার শোকে, দশরথের মরণে, সীতার আর্ত্তনাদে, মন্দোদরীর ক্রন্দনে তুমি আমি হূ হূ করিয়া কাঁদিতেছি—আবার, লক্ষ্মণের বীরবিক্রমে, রামচন্দ্রের বিশ্ববিজয়ী রণনৈপুণ্যে, ইন্দ্রজিতের অহঙ্কারে, রাবণের হুহুঙ্কারে, আনন্দিত পুলকিত ভীত চকিত স্তম্ভিত হইতেছি, আবার সেই সময়েই দেখিতেছি—আমাদেরই মধ্যে বসিয়া, কি জানি কে একজন এই সকল দৃশ্য দেখিয়াই হা হা করিয়া হাঁসিয়া অস্থির হইতেছেন. তুমি আমি হয় ত বলিব " লোকটা উন্মত্ত " কিন্তু তাহাতে তাহার হাঁসির বিরাম হইবে না—আমি বলি লোকটাকে উন্মত্তই বল, আর যাই বল. তাহাতে আপত্তি নাই। তথাপি একবার ভাবিয়া দেখ লোকটা হাঁসে কেন, একই স্থান, একই দৃশ্য, একই বিষয়, সকল লোক একবার হাঁসে একবার কাঁদে, আর ঐ একটা লোক ক্রমাগতই হাঁসে ইহার অর্থ কি ? মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—হাসি কান্নার আর কোন কারণ নাই—কারণ কেবল এই যে, তুমি আমি অভিনয় না জানিয়া, অভিনয় পদার্থ কি, তাহা না বুঝিয়া, অভিনয় দেখিতে বসিয়াছি ; আর ঐ ব্যক্তি, অভিনয় কি তাহা জানিয়া শুনিয়া অভিনয় দেখিতে বসিয়াছে—তুমি আমি দেখিতেছি রাম সত্য, রাবণ সত্য, তাই কান্নাকাটীর এত ঘটাঘটা, আর, ঐ ব্যক্তি দেখিতেছে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রাবণ সাজিয়া বসিয়া আছে—আর পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী সীতা সাজিয়া চিৎকার করিতেছে—তোমার আমার চক্ষে যাহা রাম সীতা, উহার চক্ষে তাঁহাই নীলাম্বর আর পীতাম্বর—তাই উহার মুখে হাসি ধরে না। তুমি আমি ঘটনা দেখিয়া অধীর, ও ব্যক্তি ঘটনার মূল দেখিয়া ধীর ; তুমি আমি উহাকে উন্মত্ত বলিয়া তিরস্কার করিতেছি, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ও, তোমাকে আমাকে অজ্ঞান বলিয়া ক্ষমা করিতেছে—বারম্বার যাহাকে ও ও বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি,

উন্মত্ত নহেন—পরমার্থতঃ উনি ই পরমজ্ঞানী ভক্তকুল-চূড়ামণি। এই অভিনয়ক্ষেত্র সংসারের নিখিলবস্তুকে যিনি অভিনয়ের সজ্জিতসামগ্রী বলিয়া জানেন, তিনি এই অভিনয় দেখিয়া অভিনয়ে মুগ্ধ হন না, কিন্তু অভিনয়ের মূল সেই নট নটীর খেলা দেখিয়া তাঁহাদের ই প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন—ঋষিগণ ধীর হইলে ও সেই প্রেমে উন্মত্ত, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন, সংসারের খুঁটি নাটি ভাবিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অপব্যয় করিও না, সেই ভাবনা ভাবিয়া লও, যাহাতে আর ভাবিতে হইবে না; তাই সাধক প্রাণের কথা মনকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—

দিন্ ত গেল, কাল্ ত এল, চল্ ত রে বিরলে যাই।
নিবিড় নির্জনে বসে কালকামিনীর গুণ গাই।

তুমি আমি যে দিন তাঁহাদের হইয়া সেই কথা বিশ্বাস করিব, তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত অধিকার পাইব—সেই দিন সকল ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে। আমরা ও দেখিব, সংসার বলিয়া যাহা দেখিতেছি, তাহা অভিনয়, যাহা দেখিতেছি তাহা ও তিনি, যাহারা দেখিতেছে তাহারাও তিনি—সেই চিদ্‌ঘণানন্দ ব্রহ্মময়ীই জীব সাজিয়া সংসারে আসিয়া এ আনন্দ নাটকে মাতিয়াছেন, তোমার আমার সে চক্ষু নাই বলিয়াই বলিয়া থাকি।

"মা! তোমার এ নাটক কি বা?
এত নাটক নয় ফাটকের বাবা।
নাটকের ত প্রথম দৃশ্য, নট নটীর সম্মুখে সভা,
এর্ নটের সঙ্গেই দেখা নাই তার্, নটীর সন্ধান পাবে কে বা।
[নাটকের] প্রথমে হয় প্রথমাঙ্ক, শেষে গর্ব্ভাঙ্কে আবশ্যক যে বা,
এর্, কি বা প্রথম, কি শেষাঙ্ক, গর্ভাঙ্কে আদ্যন্ত ছাবা।
যে গর্ব্ভাঙ্কে আস্‌ছে ছেলে, আবার, সেই গর্ব্ভাঙ্কে যাচ্ছে বাবা,
অম্‌নি, দেখ্‌তে২ পড়ছে সে ছিন্, তখন, কে ছেলে আর্ কে কার্ বাবা।

তুমি আমি চঞ্চল হৃদয়, তাই কাঁদিয়া অধীর, সুধীর ভক্তের হৃদয়ে

কিন্তু এই নাটকই আবার প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত করে—তাই শাক্ত সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন।

"জাননা রে মন! পরমকারণ, শ্যামা ত কখন মেয়ে নয়,
সে যে মেঘেরি বরণ, করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়, ।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজতনয়ে করে সভয়,
কভু ব্রজ পুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়,
ওসে আপনারি মায়ায়, আপনি হয় বাঁধা, যতনে এ ভব যতনা সয়।

যে রূপে যে জন করয়ে ভাবনা, সেই রূপে তার মানস রয়,
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে কমল মাঝারে উদয় হয়।

এই জন্য বলিতেছিলাম, শাস্ত্রবাক্যে বিচার করিবার কথা নাই, বিশ্বাস করিবার কারণ আছে—যাঁহার শাস্ত্র, ঋষিগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন "সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী, সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী" সংসারবন্ধন এবং মোচনের একমাত্র নিদানভূতা সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরী—যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী, তাঁহার নিকটে কাহারও ঈশ্বরত্ব স্থান পায় না, তুমি আমি বুঝি আর নাই বুঝি, সে ইচ্ছাময়ী রাজরাজেশ্বরীর অমোঘ-রাজনীতিচক্র জীবের চতুরশীতি লক্ষ জন্মে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। ইহার পরেও যদি বল, কেন হইবে, তাহার যুক্তি কি? তাহার উত্তরে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, আমি জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান জন্ম যে হইয়াছে ইহারই বা যুক্তি কি? সকলজন্মের মূলেই যুক্তি এক। যে যুক্তিতে এ জন্ম হইয়াছে, সেই যুক্তিতেই পরজন্ম হইবে—চক্রের এক কক্ষ ঘুরিলেই সকল কক্ষ ঘুরিবে, ইহা তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়ম, ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাবতার জীব সংসারে আসিয়াছে, ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরব্রহ্মে সমাহিত হইবে—ইহা জীবজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। কিরূপ নিয়মে, কোন প্রক্রিয়ায় তাহা

সঙ্ঘটিত হইবে, আমরা জন্মান্তরতত্ত্বে তাহার বিস্তৃত ব্যখ্যায় হস্তক্ষেপ করিব।

ইহার পরেও যিনি বলিবেন " মরিলেই সকল ফুরাইল, আর জন্ম হইবে কাহার ? আমরা তাঁহাকে ও সেই তত্ত্বে ই বুঝাইব যে, জীবন মরণ কাহাকে বলে, তাহা হয় ত তাঁহার অবিদিত। কারণ, জীবনতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন—নির্ব্বাণ মুক্তি ভিন্ন জীবের আর প্রকৃত মরণ নাই। তুমি আমি যাহাকে মরণ বলিয়া জানি, তাহা তোমার আমার বুদ্ধির মরণ বই, জীবের মরণ নহে। ফল কথা, শৈশব বাল্য কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য অতিবার্দ্ধক্য ইহার কোন একটি অংশ লইয়া যেমন একটি জীবনের বা জন্মের আমূল আলোচনা অসম্ভব, তদ্রূপ সমগ্র জীবজীবনের অতিক্ষুদ্রাংশ কোন একটি জন্মের ন্যায় অন্যায় লইয়া চতুরশীতি লক্ষ জন্মের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা ও অসম্ভব। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রঘুকুল-তিলক ভগবান্ রামচন্দ্র সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিয়া শরাঘাতে মারীচকে সমুদ্র পারে নিক্ষেপ করিলেন—ইহা শুনিয়া একজন অপরিনামদর্শী অধীরহৃদয় অনায়াসে ধারণা করিতে পারেন যে, বহুসংখ্যক রাক্ষস বধ করিতে করিতে রামচন্দ্রের শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছিল, তাই মারীচকে বধ করিতে পারিলেন না, শরীরে যে পরিমানে বল ছিল, তাহাতে তাহাকে যজ্ঞস্থান হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু যিনি অযোধ্যা কাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, এবং যখন দেখিয়াছেন, সীতাহরণের সময় আবার সেই মারীচ ই মায়ামৃগ রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে, তখন তিনি ই বুঝিয়াছেন রামচন্দ্রের শরীরে বল ছিল কি না ? ভূভারহারী বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবান্, রাবণনিধনরূপ দেবকার্য্য সাধনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ, পরে এই মারীচ দ্বারাই সেই রাবণবধের সূত্রপাত করিতে হইবে—ইহা মনে করিয়া ই তিনি তৎকালে মারীচকে বধ না করিয়া

সাগরপারে তাড়িত করিয়াছিলেন, নতুবা—লবণসমুদ্রপারে পাঠান অপেক্ষা, ভবসমুদ্রপারে পাঠাইতে তাঁহার অধিক বলের প্রয়োজন হইত না। অন্তর্যামী ভগবানের এ নিগূঢ় লীলারহস্য বুঝিতে হইলে ই আমাকে অরণ্যকাণ্ডের ব্যাপার জানিতে হইবে, নতুবা ঐ যাহা বুঝিয়াছি—মারীচ বধ করিবার সময়ে সর্ব্বশক্তিমানের শরীরে শক্তি ছিল না, ইহার অধিক আর বুঝিব না। তদ্রূপ শত্যযুগ ও কলিযুগের জীবের প্রতি তাঁহার ন্যায় অন্যায় বুঝিতে হইলেও আমাকে ইহার শেষ কাণ্ড ব্রহ্মকৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে, তাহার পর সমগ্রজন্মের ন্যায় অন্যায় বিচার!! এই জন্য বলি, চল্লিশ বৎসরের পরমায়ু লইয়া নিত্য-সত্য-সনাতনীর রাজ্যের ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা !!!

যদি যুক্তিবলে ই তাঁহার ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিতে হয়, তবে এক বার কেন মনে কর না—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সাধক অথচ অসিদ্ধ পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারাই কাল চক্রের আবর্ত্তনে নিজ পুণ্যপুঞ্জের আকর্ষণে কলিযুগে আবার সাধক রূপে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রায়ঃপরিপক্ক পুণ্যরাশি ফলোন্মুখ হইয়াছে, দেশ কাল পাত্রের সুযোগ অনুসারে এই বার তাঁহারা মায়ের সন্তান মায়ের ক্রোড়ে উঠিবেন। তুমি বলিবে এক যুগে সিদ্ধি হইল, কিন্তু আমি ত দেখিতেছি, তিন যুগ তপস্যা করিয়া তবে চতুর্থযুগ কলিতে সিদ্ধি হইল। আষাঢ় মাসে কাঁঠাল পাকে বলিয়া ই আষাঢ় মাসে জন্মে না, শীতে জন্মে, বসন্তে পুষ্ট হয়, তবে গ্রীষ্মে পাকে। বেল চৈত্র মাসে জন্মে এবং চৈত্র মাসেই পাকে, ইহা শুনিলে, এক জন পাশ্চাত্য খাদক (যিনি জন্মে ও কখন বেল চক্ষে দেখেন নাই) তিনি হয় ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে, এক মাসেই বেলের জন্ম মৃত্যু সমাধি শেষ—কিন্তু ভারতবাসী আর্য্যসন্তান বুঝিবেন যে—

চৈত্র মাসে জন্মে বেল, চৈত্র মাস পাকে, "
এক চৈত্রে জন্মে কিন্তু অন্য চৈত্রে পাকে !!!

বলিতে পার—কলিতে তবে সাধকের সংখ্যা এত অল্প কেন ? আমি বলি, কে বলিল অল্প? বলিবে অল্প যদি না হয়, তবে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, যেখানে সেখানে দেখিনা কেন ? আমি বলি, যেখানে সেখানে দেখি না বলিয়া জন সংখ্যা অল্প হইতে পারে, সাধকের সংখ্যা অল্প হয় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুত্রীরূপে অবতীর্ণা জগৎকর্ত্রী, নিজপিতা হিমালয়কে বলিয়াছেন, " সহস্রের মধ্যে এক জন সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে, যাহারা এই রূপ যত্ন, করে, তাহাদের ও সহস্রের মধ্যে যদি কেহ আমায় স্বরূপতঃ জানে "—কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ ও অর্জ্জুনকে ইহা ই উপদেশ করিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন " অনেক-জন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিং " অনেক জন্মের পর সিদ্ধ হইয়া তবে জীব পরমাগতি লাভ করে " বহূনাং জন্মনা মন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে " বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ হইয়া জীব আমাকে প্রাপ্ত হয় " নিরুত্তর তন্ত্রে—

শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং
বহূনাং জন্মনা মন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে
শক্তি জ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে ॥

দেবি ! শিবশক্তিময় স্বরূপতত্ত্ব ই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, বহু জন্মের সাধনার পরে জীবের এই শক্তি জ্ঞানের উদয় হয়। শক্তি জ্ঞান না হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় না" শাস্ত্র, যে পথের পথিককে এইরূপ অতি বিরল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তুমি আমি সেই পথে জনস্রোত দেখিতে চাই, কোন ভরসায় ? লক্ষের মধ্যে এক জন সাধক থাকিলে ই সাধকের সংখ্যা পূর্ণ হইল। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে। সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে " প্রতি পর্ব্বতে মাণিক্য পাওয়া যায় না, প্রতি হস্তীর মস্তকে মৌক্তিক থাকে না, সাধু ও সর্ব্বত্র পাওয়া

যায় না, চন্দন ও বনে বনে জন্মে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে বলিয়াছেন " নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনং অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ " নিরপেক্ষ নির্ব্বৈর সমদর্শি শান্ত মুনি গমন করিলে আমি তাঁহার অনুগমন করি, তাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইব এই আশায় " যাঁহার নাম করিয়া ভক্ত, ত্রিভুবন পবিত্র করেন, আজ তিনি ভক্তের পদরজঃ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবেন এমন অপবিত্রতা ভগবানের কি হইয়াছিল ? অপবিত্রতা হয় নাই, কিন্তু ভক্ত প্রেমোন্মত্ত ভগবান্ ভক্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া দেখাইয়াছেন—আমার ও যদি অপবিত্রতা সম্ভব হইত, তবে আমি ভক্তস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতাম—ইহাতে ই বুঝিয়া লও—ভক্ত কি দুর্লভ পদার্থ! শাস্ত্রান্তরে বলিয়াছেন—মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতিবাদিনং বৎসং গৌরিব গৌরীশো ধাবন্ত মনুধাবতি " মহাদেব মহাদেব মহাদেব বলিয়া যিনি কীর্ত্তন করেন, ধাবমান বৎসের পশ্চাতে গাভী যেমন ধাবিত হয়, গৌরীকে সঙ্গে করিয়া গৌরীশ তদ্রূপ সেই ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়েন। কেন ? যাঁহার চরণচ্ছায়ার অবলম্বনে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, ভক্তের পশ্চাতে পশ্চাতে সেই ভূতভাবন ভবানীপতির ধাবিত হইবার কি প্রয়োজন ছিল ? প্রয়োজন আর কিছু ই নহে, দেখাইয়াছেন—যেখানে ভক্ত, সেই খানে ই আমি " । তন্ত্র বলিয়াছেন, " পাবনানীহ তীর্থানি সর্ব্বেষা ম্বিতি সম্মতং, তীর্থানাং পাবনঃ কৌলো গিরিজে বহু কিং বচঃ তস্যৈব জননী ধন্যা ধন্যাহি জনকাদয়ঃ তস্য জ্ঞাতি কুটুম্বাশ্চ ধন্যা আলাপিনো জনাঃ। নন্দতি পিতরঃ সর্ব্বে গাথাং গায়ন্তি তে মুদা অপি নঃ স্বকুলে কশ্চিৎ কুলজ্ঞানী ভবিষ্যতি "

তীর্থ ই পবিত্রতার এক মাত্র কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু গিরিজে! অধিক আর কি বলিব, সেই তীর্থেরও পবিত্রতার কারণ কুলাচারসাধক। কৌলের জননী ধন্যা, জনক প্রভৃতি ধন্য, ধন্য তাঁর জ্ঞাতি কুটুম্বগণ, ধন্য তাঁর সহালাপিজন। কুলজ্ঞানীর পিতৃলোক আন-

ন্দিত হইয়া স্বর্গ ধামে এই গাথা গান করেন "আমাদের নিজ কুলে কেহ কুলজ্ঞানী হইবে"।

উৎপত্তি তন্ত্রে ।

যত্র বীরো বসেদ্দেবি ! দিব্যো বা পরমেশ্বরি ! তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি বীরসাধনে। যো বীরঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্দেব এব ন সংশয়ঃ। যত্র বীরো বসেদ্দেবি তত্র কস্য ভয়ং ভবেৎ। নাকাল মরণং তত্র ন দুর্ভিক্ষ্য-ভয়ং তথা। রাজপীড়াভয়ং দেবি নাস্তি তত্র কদাচন"

[তাৎপর্য্য] দেবি ! যে স্থানে বীর [বীরাচারসাধক] অথবা দিব্য [দিব্যাচারসাধক] বাস করেন, পরমেশ্বরি ! সর্ব্ব তীর্থ সেই স্থানে বাস করেন, বীরসাধিতে। যিনি বীর, তিনিই শিব, মনুষ্য-দেহধারী হইয়াও তিনি সাক্ষাদ্দেবতা, তাহাতে সংশয় নাই। দেবি ! বীর যে স্থানে বাস করেন, সেই বীরাশ্রয়ে বাস করিলে কাহার ভয়ের সম্ভাবনা ? লৌকিক বীরের আশ্রয়ে থাকিলে লৌকিক ভয় থাকে না—কিন্তু এই পারমার্থিক বীরের আশ্রয়ে যে বাস করে, তাহার অকাল মরণের ভয় নাই, দুর্ভিক্ষ্যের ভয় নাই, রাজভয় নাই, পীড়াভয় নাই—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ ভয় উপশমিত হইয়া যায়।

কুলার্ণবে—নবমোল্লাসে ।

দুর্লভং সর্ব্বলোকেষু কুলাচার্য্যস্য দর্শনং। বিপাকেন প্রভূতানাং লভ্যতে নান্যথা প্রিয়ে।১। সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো দৃষ্টো বন্দিতো ভাবিতো-পি বা। পুনাতি কুলধর্ম্মিষ্ঠ শ্চাণ্ডালোপ্যধমোপি বা।২। যত্র দেবি কুলজ্ঞানী তত্রাহঞ্চ ত্বয়া সহ। নাহং বসামি কৈলাশে ন মেরৌ নচ মন্দরে। কুলজ্ঞা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি ভাবিনি।৩। সুদূরমপি গন্তব্যং যত্র মাহেশ্বরো জনঃ। দ্রষ্টব্যশ্চ প্রযত্নেন তত্র ত্বং নন্দিতা হ্যহম্।৪। অপিদূরস্থিতো বাপি দ্রষ্টব্যঃ কুলদেশিকঃ। সমীপে বর্ত্তমানোপি ন দ্রষ্টব্যঃ পশুঃ প্রিয়ে।৫। কুলজ্ঞানী ভবেদ্যত্র স দেশঃ পুণ্যভাজনঃ।

দর্শনাদর্চ্চনাত্তস্য ত্রিসপ্তকুল মুদ্ধরেৎ । ৬। কুলজ্ঞানিন মালোক্য স্ব-সন্তানং গৃহে স্থিতং। শংসন্তি পিতরস্তস্য যাস্যামঃ পরমাং গতিং । ৭ । সমাশ্রয়ন্তি পিতরঃ স্ববৃর্ষ্টি মিব কর্ষকাঃ । যোঽস্মৎকুলেষু পুত্রো বা পৌত্রো বা কৌলিকো ভবেৎ। স ধন্যঃ খলু লোকেঽস্মিন্ পুরুষঃ ক্ষীণ-কল্মষঃ। ৮। মৎসমীপং সমায়ান্তি কুলাচার্য্যা মুদা প্রিয়ে। কৌলিকেন্দ্রে সমায়াতে কৌলিকাবসথং প্রতি। সমায়ান্তি মুদা দেবি ! যোগিন্যো যোগিভিঃ সহ। ৯। প্রবিশ্য কুলযোগীন্দ্রং ভজন্তে পিতৃদেবতাঃ। তস্মাৎ সংপূজয়েদ্ ভক্ত্যা কুলজ্ঞানরতান্ পরান্। ১০। অভ্যর্চ্চয়িত্বা ত্বাং দেবি ত্বদ্ভক্তান্নার্চ্চয়ন্তি যে। পাপিষ্ঠা ত্বৎপ্রসাদস্য ভাজনং ন ভবন্তি তে ।১১। নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দর্শনাৎ স্বীকৃতং ময়া। সাধুভক্তস্য জিহ্বাগ্রা-দশ্নামি কমলেক্ষণে । ১২। ত্বদ্ভক্তপূজনাদ্দেবি পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ তস্মাচ্চ মৎপ্রিয়াকাঙ্ক্ষী ত্বদ্ভক্তানের পূজয়েৎ।১৩। যৎকৃতং কুলশিষ্যানাং তদ্দেবানাং কৃতং ভবেৎ। সুরাঃ কুলপ্রিয়াঃ সর্ব্বে তস্মাৎ কৌলিক-মর্চ্চয়েৎ। ১৪। ন তুষ্যাম্যহ মন্যত্র তথা ভক্ত্যা সুপূজিতঃ। কৌলিকেন্দ্রে-ঽর্চ্চিতে সম্যগ্ যথা তুষ্যামি পার্ব্বতি । ১৫। যৎ ফলং নাপ্নুয়াত্তীর্থ তপোদানমখব্রতৈঃ। দত্তু মিষ্টং হুতং তপ্তং পূজিতং জপ্ত মম্বিকে। কৌলিকস্য ভবেদব্যর্থং কুলজ্ঞং যোঽবমানয়েৎ।

তৎপর্য্য। প্রিয়ে ! সমস্ত লোক মণ্ডলমধ্যে কুলাচার্য্যের দর্শন দুর্লভ, প্রভূত পুণ্য রাশির ফলপরিপাক হইলেই তাহা লাভ করা যায়, অন্যথা নহে। ২। চাণ্ডাল বা ততোধিক অধম জাতিও যদি কুলাচার ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহার নাম গুণ কীর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিলে, বন্দন করিলে এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলেও জীব পবিত্র হইয়া যায় । ৩। ভাবিনি ! কুলজ্ঞানী যে স্থানে অবস্থান করেন, তোমার সহিত আমি তথায় নিত্য বিরাজিত। কৈলাশ পর্বতে, সুমেরু পর্ব্বতে, এবং মন্দর পর্ব্বতেও আমি নিত্য বাস করিনা, কুলতত্ত্বের অভিজ্ঞ সাধককুল যে স্থানে বাস

করেন, তাহাই আমার নিত্য বাস স্থান। অর্থাৎ, কৈলাশ সুমেরু এবং মন্দর পর্ব্বতেও যদি কখন আমার অধিষ্ঠান ত্যাগ করিতে হয় তবে তাহাও পারি, তথাপি কৌলিকের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারি না। ভক্ত সাধক ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন, কৈলাশের মাহাত্ম্য অতিরিক্ত, কি কৌলের মাহাত্ম্য অতিরিক্ত। ৪। যে স্থানে মাহেশর (তান্ত্রিক) মহা-পুরুষ বাস করেন, সে স্থান দূর হইতে দূর হইলেও তথাতে গমন করিবে এবং প্রযত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিবে, যে হেতু সে স্থানে তুমি আমি উভয়ে আনন্দ সহকারে অবস্থিতি করি। অর্থাৎ এক জন মনুষ্য দর্শন করিবার জন্য এত আয়াস কেন? স্বভাব দুর্ব্বল মানব হৃদয়ে যদি এই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় ভগবান্ বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন যে, কুলসাধককে মানব মনে করিয়া তাঁহার দর্শনে বিরত হইও না, কৌলিকের দেহ মানবীয় নহে—শিবশক্তির যে কোন একটি মূর্ত্তি দর্শন জন্য জগজ্জন লালায়িত, কিন্তু কৌলিকগণ যে মূর্ত্তির উপাসক, তাহাতে আমরা উভয় মূর্ত্তি এক হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বররূপে পূর্ণানন্দপ্রমোদভরে কুলসাধক-কলেবরে বাস করি। সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করা আর আমা-দের অভিন্নযুগল মূর্ত্তি দর্শন করা একই কথা। ৫। কুলতত্ত্বের উপদেষ্টা দূরে থাকিলেও তাঁহাকে দর্শন করিবে। কিন্তু পশু নিকটে থাকিলেও তাহাকে দর্শন করিবে না। (উপাসকগণ এ স্থলে কৌলিক শব্দে কুলাচার সাধক মাত্র বুঝিয়া রাখুন, কুলাচারের লক্ষণ কি, তাহা আমরা আচার তত্ত্বে ব্যাখ্যা করিব। যিনি ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্ট পাশ-বদ্ধ জীব, তাঁহারই নাম পশু)। ৬। যে দেশে কুলজ্ঞানী জন্ম গ্রহণ করেন, সেই দেশ পুণ্যভাজন। কৌলিককে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া, জীব ত্রিসপ্ত (এক বিংশতি) কুল উদ্ধার করে। ৭। নিজবংশজাত গৃহস্থিত কুলজ্ঞানীকে অবলোকন করিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ পিতৃলোক বলিয়া থাকেন "এত দিনে আমরা পরমা গতি লাভ করিব" ।৮। কৃষকগণ যেমন সতৃষ্ণনয়নে আকাশ হইতে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন

স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষগণও তদ্রূপ উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণে প্রার্থনা করেন, আমাদের কুলে পুত্র বা পৌত্র যদি কেহ কুলতত্ত্বদীক্ষিত হয়, তবেই সেই ক্ষীণপাপ মহাপুরুষ সংসারে ধন্য। ৯। প্রিয়ে! কুলাচার্য্য গণ দেহত্যাগ করিয়া আনন্দে আমার নিকটে আগমন করেন। কৌলিকেন্দ্র, কৌলিক গৃহ (মম মন্দির) সমাগত হইলে তাঁহাকে দর্শন এবং অভিনন্দন করিবার জন্য যোগিজন সহিত যোগিনীবৃন্দ আগমন করিয়া থাকেন। ১০। কুলযোগীন্দ্রের শরণাগত হইয়া পিতৃগণ এবং দেবতা গণও তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন, সেই হেতু কুলজ্ঞানরত পরম পুরুষ গণকে ভক্তি পূর্ব্বক সম্যক্ পূজা করিবে। ১১। দেবি! তোমার অর্চ্চনা করিয়া যাহারা তোমার ভক্তগণের অর্চ্চনা না করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ কখনও তোমার প্রসন্নতাভাজন হইতে পারে না। ১২। সাধক গণ আমার সম্মুখে নৈবেদ্য স্থাপন করিলে আমি দর্শন দ্বারা তাহা স্বীকার করি মাত্র, কিন্তু কমলক্ষণে! সাধুভক্তের জিহ্বাগ্রে আমি তাহা ভোজন করি। ১৩। দেবি! তোমার ভক্তকে পূজা করিলে আমি পূজিত হই, ইহা নিঃসংশয়, সেই হেতু, আমার প্রিয়কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা যে করে সে যেন কেবল তোমার ভক্তগণেরই পূজা করে। ১৪। কুল শিষ্য গণের উদ্দেশে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহা দেবগণের উদ্দেশে কৃত হয়, সমস্ত দেবতা কুলপ্রিয়, এ জন্য কৌলিককে পূজা করিবে। ১৫। পার্ব্বতি! অন্যত্র ভক্তি পূর্ব্বক সুপূজিত হইলেও আমি সেরূপ প্রীতি পাই না, কৌলিকেন্দ্র সম্যক্ অর্চ্চিত হইলে যেরূপ প্রীত হই। ১৬। তীর্থযাত্রা, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, ব্রত সমূহের দ্বারাও যে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—কৌলিককে পূজা করিয়া জীব তাহা লাভ করিবে অন্যে পরে কা কথা। অম্বিকে! কৌলিকও যদি কুলজ্ঞের অবমাননা করেন, তবে তাঁহার দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা, পূজা, জপ সমস্ত ব্যর্থ হয়।

এই রূপ লক্ষ লক্ষ প্রমাণে শাস্ত্র যাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি আমি লৌকিক জীব, সেই অলৌকিক মহাপুরুষগণের দর্শন

পাইব কোন পুণ্য বলে ? কোন্ পর্ব্বতে, কোন্ তপোবনে, কোন্ মহা-পীঠে কোন্ মহাশ্মশানে গিয়াছি ? কোন্ মুনির আশ্রমে, কোন্ সাধুর মঠে, কোন্ দণ্ডীর কোন্ ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে শরণাপন্ন হইয়াছি ? কোন্ মন্ত্র জপ করিয়াছি ? কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়াছি ? কোন্ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি ? কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছি ? শম দম উপরতি তিতিক্ষা ধ্যান ধারণা সমাধির কি অভ্যাস করিয়াছি ? শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের কোন্ উপায় পাইয়াছি। বিবেক বৈরাগ্যের কি বুঝিয়াছি ? দোহাই ধর্ম্মের, প্রাণের কবাট খুলিয়া বল ভাই ! এমন কর্ম্ম কি করিয়াছি, যাহাতে দেব-দুর্লভ সাধু সাধকের দর্শন পাইব। বলিবে, কিছুও যদি না করিয়া থাকি, তথাপি তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, অন্তরে প্রণাম করি, দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মনে মনে প্রার্থনা করি। এই কথাটিই সত্য, মনে মনে প্রার্থনা করি, কিন্তু কার্য্যে নয়—যদি কার্য্যে হইত, তবে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতাম না, উন্মত্ত প্রাণে অলক্ষিত পথে ছুটিতাম, যেখানে দর্শন পাইতাম, চরণে ধরিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম—কাঁদিয়া বলিতাম প্রভো ! কোন উপায় করি নাই, আমার উদ্ধারের কি হইবে ? সত্য করিয়া বল দেখি, কাহারও প্রাণ কি এমন ভাবে কাঁদিয়াছে ? যদি কাঁদিত, তবে আর কাঁদিতে হইত না। এই স্থানেই ভক্ত কবি দাশরথি রায় বলিয়াছেন—

"মা কর্ বাছা"! পারিবি জান্তে, আর তোকে হবে না কান্তে,
কেঁদে কেঁদে সাঙ্গ হল কান্না।
মায়ে মিলে মা বলে ডাকে, সেই ছেলেই ত বাঁধে মাকে,
লজ্জা পেয়ে মা তাকে কাঁদান্ না।
মা চায় না যে সব ছেলে, আর ২ সঙ্গী পেলে,
আমোদে বেড়ায় হেঁসে খেলে।
মাতা তার কাছে না যান, অনায়াসে অবকাশ পান,
কাঁদে যে ছেলে তাকেই করেন কোলে।

দীনদয়াময়ি ! বলিয়া দাও মা ! কত দিনে তোমার জন্য, তোমার সাধকের জন্য তেমন করিয়া কাঁদিব ? যে দিনে তুমি আসিয়া বলিবে "আর্ তোকে হবে না কান্‌তে কেঁদে কেঁদে সাঙ্গ হলো কান্না"।

তাই বলিতেছিলাম, সান্নিপাতিক বিকারের রোগীর দুঃখ বোধ নাই—কাঁদিতে শিখিব কেন ? হরি হরি ! তুমি আমি কাঁদিতে শিখিব ? কোন সাংসারিক কার্য্যের সময়ে যদি সাধকের বেশ ধরিয়াও কেহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, অমনি তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কতই না ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া তর্জন গর্জনে তাহাকে নিজের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাড়িত করিয়া তবে শান্তি পাই, সেই তোমার আমার পাপপ্রাণ নরকের জন্য না কাঁদিয়া সাধকের জন্য কাঁদিবে ? অন্তর্যামিনি ! নিস্তারিণি ! তুমি জান মা ! এ পাপের নিস্তার কত দিনে হইবে ? যে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিতে গেলে পাপের বিভীষি-কায় অধীর হইয়া পড়িতে হয়, সেই হৃদয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া শাস্ত্রের অবমাননা, সাধুর অবমাননা, ধর্ম্মের অবমাননা করিতে যাই—আবার সেই হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া সাধুদর্শনে যাত্রা করি, ধন্য আমার নির্লজ্জতা ! যদি আজ্ সাধু সাধক কেহ থাকিতেন, তবে এক দিন না এক দিন অবশ্য আমার গৃহে আসিয়া দর্শন দিতেন, ইহা কি অহঙ্কারের কথা নহে ? আস্পর্দ্ধার আড়ম্বর নহে ? কেন ? তুমি আমি, কি এমন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ হইয়াছি যে, গৃহে বসিয়া সাধকের দর্শন পাইব। বলিবে আমার বিদ্যা আছে, ধন আছে, জন আছে, । আছে ! তাহাতে তাঁহার কি ? মূর্খ অজ্ঞান তুমি, তাই তাঁহার কাছে বলিতে যাও " আমার বিদ্যা আছে "। মহাবিদ্যার প্রসাদে অষ্টসিদ্ধি যাঁর পদতলে, তাঁহাকে তুমি বিদ্যার পরিচয় দেও, ইন্দ্রত্ব পদ তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা সেই তারাপদ সারসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে তুমি ধনের অহঙ্কার কর, আর স্বয়ং শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যাঁর কটাক্ষকিঙ্কর, সেই সর্ব্বেশ্বরী মায়ের

সন্তানকে তুমি জন বল দেখাইতে যাও, ধন্য তোমার বুদ্ধিবল ! ! ! আর, গৃহে বসিয়া তীর্থে গিয়া শ্মশানে মশানে ঘুরিয়াও যদি কখন সাধু সাধকের দর্শন পাই, তাহা হইলেই কি তাঁহাদিগকে চিনিবার ক্ষমতা আমার আছে ? গৃহে গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন বলিয়াই কি আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি ? ভগবান্ নৃসিংহ-দেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া যখন ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিলেন, প্রহ্লাদ অমনি প্রার্থনা করিলেন "যা প্রীতি রবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ত্বামনুস্মরত স্তম্মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু "। " প্রভো ! বিবেকহীন সাংসারিক পুরুষের যেমন স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে অবিনাশী প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহারা যেমন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সংস্কারের গুণে নিরত স্ত্রী পুত্রাদির অনুধ্যান করে তদ্রূপ আমি যেন তোমাকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিতে থাকি, আমার হৃদয় হইতে যেন তোমার প্রতি তেমন অটল প্রেম কখনও অপসারিত না হয় । প্রেমাস্পদ মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ সম্মুখে দণ্ডায়মান, তথাপি প্রহ্লাদ বলিলেন না যে "তোমাকে চাই"। ভগবান্‌কে উপেক্ষা করিয়া ভক্তিকে ভিক্ষা করিলেন, কেননা চতুরচূড়ামণি প্রহ্লাদ বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বব্যাপী ভগবান্ দুর্লভ নহে, দুর্ল্লভ তাঁহাতে ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে ভগবান্ যদি সম্মুখেও থাকেন তবে তাঁহার সে থাকা আর না থাকা দুইই সমান। কেননা, ভক্তি ব্যতিরেকে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, আর ভক্তি যদি অন্তরে থাকে, তবে ভগবান্ শতকোটি যোজনান্তরে থাকিলেও ভক্ত যখন যে রূপে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই রূপে তাঁহাকে দর্শন দিতে হইবে, সমুদ্র সঙ্গমিশ্রিত নদীর জল যেমন সমুদ্র হইতে পৃথক্ হয় না, ভগবৎ-সঙ্গমিলিত ভক্তের ভাবও তদ্রূপ ভগবদ্ভাব হইতে পৃথক্ হয় না । সর্ব্বথা দুর্লভ হইলেও ভগবান্ যেমন ভক্তির বশবর্ত্তী, সর্ব্বত্র বিরল হইলেও ভক্ত তেমনি প্রেমের বশবর্ত্তী। ভগবন্মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিতেও যেমন ভক্তির অভাবে আমরা তাঁহা হইতে শত যোজন দূরে, তদ্রূপ সাধু সাধক ভগবদ্ভক্তের দর্শন লাভ

হইলেও আমরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ। জ্ঞান চক্ষু ব্যতীত চর্ম্মচক্ষুতে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না তাহা দর্শন করিতে তুমি আমি চির অন্ধ। তন্ত্র শাস্ত্র বলিয়াছেন "যথা স্ত্রী পুত্র মিত্রাদি দৃষ্ট্বা চেতঃ প্রহৃষ্যতি। তথা চেৎ কৌলিকান্ দৃষ্ট্বা স ভবেদ্ যোগিনীপ্রিয়ঃ"। স্ত্রী পুত্র মিত্রাদি দর্শন করিলে যেমন স্বভাবতঃ হৃদয় আনন্দিত হয়, কুল সাধক গণকে দর্শন করিয়া যদি অন্তঃকরণ তদ্রূপ প্রেম পুলকিত হয়, তবেই তিনি যোগিনী গণের প্রিয়পদ লাভ করেন। এখন সত্য করিয়া বলিতে গেলে আমি কি তদ্রূপ আনন্দ বিস্ফারিত প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে সাধককে দর্শন করিয়া থাকি? যদি তাহাই করিব, তবে কোন্ প্রাণে সাধক সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরিজন সঙ্গে বিমুগ্ধ হই? আবার সাধু দর্শন পাইয়াও কেন পরিজন বিরহে ব্যাকুল হই? এই জন্য বলিতেছিলাম সাধু অবশ্য সাধু, কিন্তু আমার দর্শন অসাধু, তাই সে দর্শন সাধক-দর্শনের সাধক নহে, বরং বাধক। তবে বল এখন, নগরে ২ গ্রামে ২ সাধক দেখি না বলিয়া সাধক নাই মনে করা কি মহাপাপ নহে? দেখিতে পাই বা না পাই, সংসারে সাধক নাই বলিয়া নিজ নরকপথ প্রশস্ত করিও না। কলিযুগে তান্ত্রিক উপাসনায় সাধক এক জন্মে সিদ্ধ হইবেন শুনিয়াও চমকিত হইও না। যে মুহূর্ত্তে বসিয়া তুমি আমি এই সাধক তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করিতেছি, নিশ্চয় জানিও এই মুহূর্ত্তেই বিশাল বিশ্বরাজ্যে শত শত সাধক সেই সর্ব্বার্থ সাধিকার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জন্ম ধন্য, জীবন ধন্য, জগৎ ধন্য করিতেছেন। ধন্য আমরা যে তাঁহাদের পদ-স্পর্শ-পূত ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

বেদ থাকিতে তন্ত্র কেন?

এখন দ্বিতীয় আশঙ্কা, "উপাসনা শাস্ত্র বেদ থাকিতে আবার তন্ত্র-শাস্ত্রের সৃষ্টি কেন হইল?" প্রথমে এই আপত্তি লইয়াই আমাদের আপত্তি, তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি কেন হইল, সে ত পরের কথা। জিজ্ঞাস

করি, তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল এ কথার সৃষ্টি হইল কোথা হইতে ? আজ কাল্‌কার শিক্ষিত সূক্ষ্ম সমালোচক-সম্প্রদায় হয় ত আমাদের এ কথা শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিবেন। চমকিবার কারণ এই যে আমরা বলিতেছি "শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল" এ কথা অসম্ভব। তবেই আমাদের শাস্ত্র নিত্য পদার্থ। বুঝিতেছি যে, তুমি হয় ত বলিতেছ কি গোঁড়ামি! কি অন্ধদৃষ্টি! কি ভয়ঙ্কর কুসংস্কার। বল তাহাতে ক্ষতি নাই, বিপরীত কারণ সত্ত্বেও যদি কেহ তাহা না দেখিয়া অন্ধের ন্যায় এক পক্ষ পাত করে, তবে তাহারই নাম যেমন গোঁড়ামী, আবার কারণ সত্ত্বেও যদি তাহা উপেক্ষা করিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হওয়া যায় তবে তাহারও নাম তেমনই নাস্তিকতা। শাস্ত্রকে অভ্রান্ত এবং নিত্য বলিলে তোমার মতে গোঁড়ামী হয়, কিন্তু আমার মতে শাস্ত্রকে অভ্রান্ত এবং নিত্য না বলিলেই নাস্তিকতা হয়। যে কারণের উপেক্ষা ও অপেক্ষা লইয়া নাস্তিকতা ও গোঁড়ামী—আমরা এক বার সেই কারণকূট অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমতঃ বিরোধের মূলভিত্তি এই যে তুমি বলিতেছ জগৎ দেখিয়া তদনুসারে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। আর আমি বলিতেছি, শাস্ত্র দেখিয়া তদনুসারে জগৎ রচিত হইয়াছে। তাই তোমার মতে শাস্ত্রের কর্ত্তা মানুষ, আর আমার মতে শাস্ত্রের কর্ত্তা কেহ নাই। কেবল তাহার প্রকাশক স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এবং তদনুক্রমে ঋষি পরম্পারা। এই সময়ে হয় ত আমাদের দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়েরা একটু বিরক্ত হইবেন। কেননা তাঁহারা হয়ত শুনিয়াছেন বা বেদে দেখিয়াছেন যে বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, যাহা কিছু, সমস্তই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-মুখনির্গত, আমরাও সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে তাঁহারা যে বেদকে পরমেশ্বরের ভাষা বলিয়া জানেন, যাঁহারা বেদের প্রকাশক, সেই পরমারাধ্য দেবত্রয় কিন্তু সেই বেদকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—" বৃহন্নীলতন্ত্রে, বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি! স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদ স্তৎকর্ত্তা নাস্তি সুন্দরি! স্বয়ম্ভুবে

ভগবতা বেদো গীত স্তথা পুরা। শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোস্য ন কারকাঃ ” নগনন্দিনি ! বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া জান, সুন্দরি ! বেদ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, কেহ তাহার কর্ত্তা নাই। পুরা কালে ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার নিকটে বেদ গীত হয়। তদবধি স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্য্যন্ত যুগে যুগে সকলেই বেদের স্মরণকর্ত্তা, কেহ “ কর্ত্তা নহেন ” শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে ঋগ্বেদ সামবেদ আদি সমস্ত ব্রহ্মের নিশ্বাস নির্গত। অনেকে ইহাকেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ প্রণয়নের প্রবল প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি ইহা প্রণয়নের প্রমাণ নহে কিন্তু বেদ প্রকাশের এবং বেদের নিত্যতার প্রমাণ। বেদ নিশ্বসিত বলিয়া তাঁহার প্রণীত নহে। কারণ, নিশ্বাস কাহারও নিজ প্রণীত পদার্থ নহে। আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসের নির্গম ও প্রবেশের কারণ, কিন্তু কেহ স্রষ্টা কর্ত্তা নহি, কেননা নিশ্বাসের যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহার বিনাশ ত মহা প্রলয়েও অসম্ভব। আমাদের দেহের ন্যায় ব্রহ্মের দেহ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত জড় পদার্থ নহে। সেই নিত্য চৈতন্যলীলাময় দেহের সমস্তই তিনি, তাঁহা হইতে তাঁহারই অংশবিশেষ বেদ নিশ্বাস রূপে নির্গত হইয়াছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন “ বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি ! ”

ভগবান্ সমস্ত সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাঁহার মত আর একটিকে সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার মত বলিলেই বুঝিতে হইবে, তিনি নহেন, অথচ তাঁহার সদৃশ। রাম, কৃষ্ণ, গঙ্গা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, যাহাই কেননা বল, সমস্তই তাঁহার মত তিনি—তাঁহা হইতে ভিন্ন, অথচ তাঁহার মত কাহাকেও দেখাইতে পারিবে না, যদি তাঁহার মত আর কেহ থাকিত বা হইত, তবে তিনি কখন এক অদ্বিতীয় অধীশ্বরী হইতেন না। আমার আমিত্ব লইয়া আমি যেমন কেবল আবির্ভূত তিরোহিত হইতে পারি অথচ আমার সদৃশ আর এক জন “ আমিকে ” আমি সৃষ্টি করিতে পারি না, তদ্রূপ ব্রহ্মের মূর্ত্যন্তর বেদকেও ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে

পারেন না। কেবল নিশ্বাস রূপ বেদকে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকাশ এবং মহাপ্রলয়ে প্রশ্বাস রূপে সংহরণ করিয়া থাকেন মাত্র। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—" দোষাঃ সন্তি ন সন্তীতি পৌরুষেয়েষু বিদ্যতে। বেদে কর্ত্তুরভাবাত্তু দোষশঙ্কৈব নাস্তিচ"। দোষ আছে, না আছে, এ বিচার পুরুষ-নির্ম্মিত বাক্যে সম্ভবে, বেদে কর্ত্তার অভাব হেতুক দোষের আশঙ্কাই আদৌ নাই। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে তবে ত পরমেশ্বরের সৃষ্টিই অসম্ভব, কেননা তুমি আমি জীব মাত্র সমস্তই যখন তিনি, তখন আর সৃষ্টি করিবেন কাহাকে ? এইরূপে যদি ব্রহ্মের সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া উঠে, তবে আমরা তাহাতে ভীত নই । কারণ, যে আর্য্যের নিখিল শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, মায়া বিজৃম্ভন ব্যতীত পরমার্থতঃ ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিছুই নাই, সে আর্য্য সন্তান কেবল এক " সৃষ্টি নাই " শুনিয়া বিস্মিত হইবেন কেন ? বস্তুতঃ পরমার্থতঃ সৃষ্টি না থাকিলেও মায়িক জীব তোমার আমার পক্ষে তাহা অবশ্য আছে। সেই সৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি, বেদের সেরূপ সৃষ্টিও কিছু হয় নাই। রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারও যেমন নিত্য ব্রহ্ম, বেদও তেমনি নিত্যব্রহ্ম। স্বপ্রকাশ হইলেও তাঁহার যেমন মায়াবলম্বনে কৌশল্যার উদরে দেবকীর গর্ভে প্রকাশ, বেদ স্বপ্রকাশ হইয়াও তেমনি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাবলম্বনে ভগবানের হৃদয়ে আবির্ভূত এবং নিশ্বাস-নির্গত। বেদ তন্ত্র পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ—শব্দ ময় জড় ভাষা আপনি আপনার কর্ত্তা এ কথা শুনিতেই অসম্ভব, এবং বক্তাকে উন্মত্ত বলিয়া বোধ হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি অতি অল্প। আমরা মন্ত্রতত্ত্ব প্রকরণে এ বিষয়ের যথা শাস্ত্র মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইব। আপাততঃ মধ্যবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদের জন্য সাধক ! আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এ স্থলে এক্ষণে বুঝিবার কথা এই যে আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র মানব-প্রণীত হইলে দোষ কি ? কোন্ দোষের ভয়ে ইহাকে স্বপ্রকাশ এবং ঈশ্বর-নিশ্বাস নির্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করা

হইতেছে ? আমরা বলি, কোন দোষের ভয়ে নহে, বেদ স্বপ্রকাশ বলিয়াই স্বপ্রকাশ। অন্ধকারের ভয়ে প্রদীপের প্রভা স্বীকার করি না, অন্ধকার থাক্, আর নাই থাক্, প্রদীপ নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ। যাহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, অথচ যাহার দ্বারা সমস্ত প্রকাশ পায়, তাহারই নাম স্বপ্রকাশ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"মাধুর্য্যাদি স্বভাবানা মন্যেষু স্বগুণার্পিণাং। স্বস্মিং স্তদর্পণাপেক্ষা নো নচাস্ত্যন্যদর্পকম্" মাধুর্য্য-রহিত পদার্থে মাধুর্য্যের অর্পণকারী মধুর স্বভাব যে সকল পদার্থ, তাহাতে অন্য পদার্থের অর্পণ করিয়া মধুর করিবার অপেক্ষা নাই, এবং মধুর পদার্থে মাধুর্য্যের অর্পণ করিবে এমন কোন পদার্থও নাই। যেমন গুড় শর্করা সিতোপল মধু ইত্যাদি দ্বারা আমরা দুগ্ধ ক্ষীর দধি ইত্যাদি পদার্থকে মধুর করিয়া লই, তদ্রূপ মধুকে আর মধুর করিবার প্রয়োজন নাই এবং মধুকে মধুর করিতে পারে এমন কোন পদার্থও সংসারে নাই। তদ্রূপ গৃহপ্রাঙ্গন, গৃহাভ্যন্তর এবং গৃহস্থ বস্তু সমস্তকে আমরা প্রদীপ দ্বারা প্রকাশিত করিয়া লই, কিন্তু প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য পদার্থের আবশ্যক হয় না। প্রদীপ আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, তাই তাহার নাম স্বপ্রকাশ। সংসারে প্রকাশ-শক্তি কেবল তেজের। প্রদীপ নিজে সেই তেজঃ পদার্থ, সুতরাং তাহাকে প্রকাশ করিবার আর কে আছে ? এই মধু ও প্রদীপের ন্যায় বেদও স্বপ্রকাশ। বেদ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত নিখিল পদার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিবেন কিন্তু তাঁহার প্রকাশক তিনি ভিন্ন আর কেহ নহেন। সকলকে যে প্রকাশ করিবে, তাহার প্রকাশক কে ? কেননা সকল হইতে অতিরিক্ত পদার্থ অসম্ভব।

অন্ধকারের ভয়ে প্রদীপের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও প্রদীপ যেমন স্বপ্রকাশ হইয়া অন্ধকারকে দেখাইয়া তাহা ধ্বংস করে, তদ্রূপ দোষের ভয়ে শাস্ত্রের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার না করিলেও শাস্ত্র স্বয়ং-প্রকাশ হইয়া দোষ দেখাইয়া তাহা ধ্বংস করিয়া দেন। সে দোষ এই।

আর্য্যগণ বলিয়াছেন "ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা বিরহিতত্বমাপ্তত্বম্" ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা) বিরহিত যাহা, তাহাই আপ্ত। শাস্ত্রের নাম আপ্ত বাক্য অর্থাৎ যাহা কিছু শাস্ত্র বাক্য, তাহাই ভ্রম প্রমাদ প্রতারণাপরিশূন্য। মানব প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র, ইহা শুনিলেই আমাদের বোধ হয় যেন আলোক আর অন্ধকার দুই জনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। শাস্ত্র স্বতঃ সিদ্ধ অভ্রান্ত, মানব স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্ত। শাস্ত্র অপ্রমত্ত, মানব নিত্য প্রমত্ত। শাস্ত্র নিত্য কৃপা নিধান, মানব প্রতারণার নিদান। মানব অশ্রান্ত জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী, শাস্ত্র অনাদি অনন্ত। মানব ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয়ের দাস, শাস্ত্র অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ পদার্থের প্রদর্শক। মানব স্বার্থ কীট, শাস্ত্র নিঃস্বার্থ জগদ্গুরু। এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব সমূহের একত্র সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা কেবল উন্মাদবিকার বই আর কিছুই নহে। চাক্‌চিক্য ময় বিজ্ঞানের তরলতরঙ্গে অধীর হইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন, শাস্ত্র কেবল ভূয়োদর্শনের প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যত দূর জানিয়াছে সে তত দূর বলিয়াছে বা লিখিয়া গিয়াছে, এ কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শাস্ত্র নিহিত তত্ত্ব সকল সত্য হউক্ আর না হউক্ শাস্ত্র বক্তার অধ্যবসায়ের বলিহারি! আমরাও সে বলিহারি দিতে কাতর নহি, কিন্তু বলি এই যে নিজে অধঃপাতে গিয়া পরকে বলিহারি দেওয়া সুকঠিন। তুমি নিজে অন্ধ, তোমার আবিষ্কৃত কণ্টকাকীর্ণ পথে লইয়া গিয়া আমাকেও অন্ধকূপে ডুবাইবে, আর আমি তোমার ভূয়োদর্শিতার প্রমাণ দেখাইব এ আশা করা তোমার বড়ই বিড়ম্বনার কথা। স্বীকার করিলাম, তুমি আমা অপেক্ষা অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াছ কিন্তু যাহা দেখিয়াছ যাহা শুনিয়াছ, তাহা যে অভ্রান্ত, অপ্রতিষিদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, ইহা কে বলিল? এক দিন নদীতে গিয়া তুমি হয় ত দেখিয়াছ, বড়ই সুনির্ম্মল সুশীতল জল। তোমার সেই কথায় নির্ভর করিয়া স্নান করিতে নদীতে নামিলে আমাকে যে কুমীর ধরিবে না, ইহা তোমায় কে বলিল? জল নির্ম্মল হইলেই তাহাতে

বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না ইহার প্রমাণ কি? নদীতে যাওয়া তোমার ভূয়োদর্শনের ফল হইতে পারে, কিন্তু আমার জীবনের জন্য দায়ী কে?

দ্বিতীয়তঃ এই রূপ ভূয়োদর্শন অনেকটা ভূও দর্শন বলিয়া বোধ হয়। একে ত অন্ধের দর্শন, তার উপরে আবার কত দিনের দর্শন, তাহার নিদর্শন পাওয়া কঠিন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ ধরিয়া মানবের ভূয়োদর্শন যত দূর হইতে পারে, তাহাতে আর্য্যাবর্ত্ত ভারত বর্ষ ঊর্দ্ধ সংখ্যা জম্বুদ্বীপ ও তৎপরে হয় ত লবণ সমুদ্র, পর্য্যন্ত আমাদের জানা আছে। এই ত চূড়ান্ত দর্শন। এখন জিজ্ঞাসা করি "লবণেক্ষু সুরাঃসর্পি দধি দুগ্ধ জলান্তকাঃ সমুদ্রাঃ সপ্ত চৈবান্যে" এই লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, জল সমুদ্র শাস্ত্রে এ সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ কে করিল? বলিবে যে করিয়াছে সে ভ্রান্ত। আমি বলি সে ভ্রান্ত হয় হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। এ সপ্ত সমুদ্রের নাম কোথা হইতে আসিল? অপার সমুদ্র পার হইয়া তুমি আমি ত সে দেশে, সে সমুদ্রে যাই নাই। আজ্ কাল বিদেশবাসী সুদক্ষ সমুদ্রপোতবাহি-সম্প্রদায় যাহার উপান্ত প্রদেশ দর্শন করিয়াই পশ্চাৎপদ, সেই দুস্তর লবণ সমুদ্রের পারান্তরে পরম্পরাক্রমে অবস্থিত এই সপ্ত সমুদ্রের নাম এ দেশে আসিল কোথা হইতে? বলিতে পার "তোমার লবণ সমুদ্র মানি না"। কিন্তু যাহার লবণে শরীররক্ষা, তাহার নিকট এ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইলে ভাষায় তোমাকে কি বলিবে, তাহা তুমি জান। রাখিয়া দাও তোমার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, রাখিয়া দাও তোমার দার্শনিক বিচার, রাখিয়া দাও তোমার বৈজ্ঞানিক যুক্তি, কাহারও কথা শুনিতে চাই না। প্রত্যক্ষের প্রতি অন্য প্রমাণ মানিব না। শাস্ত্র ভিন্ন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিব না। দশেন্দ্রিয় সংযুক্ত মানব হইয়া যাহারা শাস্ত্র সিদ্ধ প্রত্যক্ষ সত্য এই সমস্ত পদার্থের অপলাপ করিতে—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কথা মনে হইবার পূর্ব্বেই যেন, অমরসিংহ, প্রতাপসিংহ, শিবজীর কথা স্মরণ হয়! হা!

সনাতন ধর্ম্ম স্তম্ভ বীরেন্দ্রকেশরিগণ ! আজ্ এ ঘোর সময়ে তোমরা কোথায় ? অথবা তোমাদের সেই সাধন পূত জ্বলন্ত জ্যোতিঃ মন্ত্রশাস্ত্রেই মিসিয়া আছে। অক্ষরে অক্ষরে মাত্রায় মাত্রায় আজ্ সে জ্যোতি দেখাইয়া দও—ভারত কুমারের তপস্তেজে ভারতের শাস্ত্র দেদীপ্যমান হউক। ইহার পরে সপ্ত দ্বীপা বসুন্ধরা—তাহারও প্রত্যেক দ্বীপে নয় নয় টি করিয়া বর্ষ। তাহার কোন্ বর্ষে কিরূপ ভূমি, কাহার কত পরিমাণ, তাহার উচ্চাবচ অবস্থান কিরূপ, তথায় কিরূপ আকৃতি, কিরূপ প্রকৃতির লোকের বাস, কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ আচার, কত বর্ষ পরমায়ু, কোথায় কোন্ দেবতার বিশেষ প্রভাব, তাহার কোন্ দেশ কোন্ দেবতার উপাসক, তৎপরে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ বিবরণ এ সকল কথার ত উত্থাপনই হয় নাই। বল ! এ সকল কি স্বপ্ন, না মায়া মোহ অথবা কেবল কল্পনা ? কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দাও, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আপন মাথা বাঁচাইয়া বল, এ সকল কল্পনা হইলে, লবণ সমুদ্র যেমন কল্পনা, ভারতবর্ষ যেমন কল্পনা, তুমি আমিও তেম্‌নি কল্পনা। আমরা বলি এত কল্পনা না বলিয়া একা তোমাকে তুমি কল্পনা বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেই সকল অপদ্ চুকিয়া যায়। তুমি আমিত কীটানুকীট বই নই, যাঁহাদের তীব্রাভিভাবিনী ধীশক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে তাঁহারাও শেষে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অবতারণায় সকল প্রমাণ পদদলিত করিয়া জগৎকে ডাকিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন " শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—সমস্ত প্রমাণ যে স্থলে নিরস্ত, সেই নিবিড় অন্ধতম প্রদেশে এক মাত্র শাস্ত্রই কেবল জ্বলন্ত জ্যোতিঃ। সেই শাস্ত্র যাহার " মানব প্রণীত " বলিয়া সন্দেহ বা বিশ্বাস জন্মে, জানিনা জন্ম জন্মান্তরের প্রারব্ধ তাহার কতই প্রবল ! চুরি করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না, ঈশ্বর আছেন, বিশ্বাস কর, প্রেম কর, অনন্ত শান্তি পাইবে, ইত্যাদি কয়েকটি বাঁধি গতের উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের ধর্ম্মভিত্তি অবস্থিত, তাহাদের সেই ধর্ম্ম

শাস্ত্র ভূয়োদর্শনের ফল হইতে পারে, সেই সংস্কারের বাধ্য হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্ত্তি সনাতন ধর্ম্ম এবং সনাতন শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাস অপেক্ষা অধঃ পাত আর কিছুই নাই। "আহার নিদ্রাভয় মৈথুনঞ্চ" এই চারিটি বৃত্তির নির্ব্বিবাদে সমাঞ্জস্য রক্ষা করা যে শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না ইত্যাদি কয়েকটি ব্যবস্থা দিয়া সে শাস্ত্র নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু তত্ব যাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে, সেই শাস্ত্রের সত্যমিথ্যা বিচার করা তোমার আমারি পক্ষে বড়ই ধৃষ্টতার কথা! পূর্ব্বোক্ত তত্ব সকল আমরা পূজা প্রকরণে যথা সাধ্য প্রপঞ্চিত করিব। অপূর্ণ মানবের দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে তাহাই অপূর্ণ। যাহা অপূর্ণ তাহা কখন চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে না যাহা চরমসীমায় না পৌঁছিয়াছে তাহা পূর্ণ ব্রহ্মতত্বের পূর্ণ অপরিচিত, সেই অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস করিয়া অলক্ষিত পথে যাত্রা করিতে কে সাহসী হয়, তাই দেবগণ ঋষিগণ আপ্তবাক্যে নির্ভর না করিয়া আপ্ত বাক্য শাস্ত্রকেই এক মাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সন্তানের শিক্ষার জন্য পিতা মাতার চির দায়িত্ব, কোন্‌টি জীবনের পথ, কোন্‌টি মরণের পথ পিতা মাতা তাহা দেখাইয়া সন্তানকে সাবধান করিয়া না দিলে অবোধ শিশু কি উপায়ে রক্ষা পাইবে? সেই দায়িত্ব অনুসারেই নিখিল বস্তু তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ স্বয়ং শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছেন "শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মদীয়া শাশ্বতী তনুঃ" অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম [শাস্ত্র], এবং পর ব্রহ্ম (তুরীয় চৈতন্য) এ উভয়ই আমার নিত্য শরীর। পরমেশ্বরী নয়নোচনের অগোচর হইলেও শাস্ত্রমূর্ত্তি অবলম্বনে জগদ্ধাত্রী সাজিয়া জগৎকে ক্রোড়ে করিয়া বলিতেছেন আর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং বেদান্ন প্রমদিতব্য মাচারান্না পগন্তব্যম্"

প্রমাদভরে সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে, পরিভ্রষ্ট হইও না, বেদ হইতে পরিচ্যুত হইও না, আচার হইতে, উৎপথে গমন করিও না” সেই গম্ভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতে, প্রান্তরে, তপোবনে, নদীতীরে, কুটীরে, মন্দিরে, রাজেন্দ্রগণের যজ্ঞ মণ্ডপে, গৃহস্থ গণের গৃহ-কক্ষে, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে, কোটি কোটি যজ্ঞ কুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে, পৃথিবীর যজ্ঞাগ্নিপ্রভায় স্বর্গীয় সৌধশিখর রঞ্জিত হইয়াছে, দ্বাদশবার্ষিক, শতবার্ষিক, সহস্রবার্ষিক ব্রতে যজ্ঞসমাপন করিয়া তপোনির্দ্ধূতকল্মষ কলেবরে কত কোটি কোটি আর্য্য মহাপুরুষ ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে।

তন্ত্রের অবতারণা।

দেখিতে দেখিতে কাল নাটকের কঠোর যবনিকা অবতীর্ণ হইতে লাগিল, মায়ামলীমস অধর্ম্মদুর্দ্দিন ধীরে ধীরে ধর্ম্ম জগতে অনাচারের অন্ধকার ঢালিয়া দিতে লাগিল। জীব সকল অজ্ঞাতসারে সেই অন্ধকারে ডুবিয়া উৎপথে পদার্পণ করিতে আরম্ভ করিল, রোগে শোকে ক্ষোভে দুঃখে জগতের প্রাণ জর্জ্জরিত হইল। রুগ্নসন্তান রোগের বিকারে কুপথ্য ভোজন করিয়া আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনে, সে তাহা নিজে বুঝিতে না পারিলেও পরিণামদর্শিনী জননী তাহা বুঝিয়া থাকেন। তাই, সন্তানের অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গল দর্শন করিয়া মঙ্গলমূর্ত্তি প্রসূতীর প্রাণ স্বতএব ব্যথিত হয়। সেই প্রাকৃতিক নিয়মলীলার অবলম্বন করিয়াই ত্রিলোকজননী সর্ব্বমঙ্গলার স্নেহময় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, আপন-লীলায় আপনি মুগ্ধ হইয়া কাতর হৃদয়ে বৈদ্যনাথকে বলিলেন “দেবদেব! জীব নিস্তারের উপায় কি?”

কুলার্ণবে—দেব্যুবাচ। ভগবন্ দেব দেবেশ পঞ্চকৃত্যবিধায়ক সর্ব্বজ্ঞ ভক্তিসুলভ শরণাগতবৎসল। কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধে। অসারে ঘোরসংসারে সর্ব্বে দুঃখমলীমসাঃ। নানাবিধশরীরস্থা অনন্তা জীবরাশয়ঃ। জায়ন্তেচ ম্রিয়ন্তেচ তেষা মন্তো নবিদ্যতে। ঘোর দুঃখাতুরা দেব ন সুখী জায়তে কচিৎ। কেনোপায়েন দেবেশ মুচ্যতে বদমে প্রভো।

দেবী বলিলেন, ভগবন্ ! তুমি দেবগণেরও দেবতা, ঈশ্বর, পঞ্চ কৃত্যের বিধানকারী, সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তিসুলভ এবং শরণাগত বৎসল, তুমি পরমেশ্বর হইয়া ও কুলসাধক গণের ঈশ্বর এবং করুণারূপ অমৃতের এক মাত্র বারিধি। দেব ! এই অসার ঘোর সংসারে সমস্ত জীব দুঃখে মলিন, নানাবিধ শরীরস্থিত অনন্ত জীবরাশি নিরন্তর জন্মমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার অন্ত নাই। সকলেই ঘোর-দুঃখাতুর, কেহ সুখী হয় না, দেবেশ প্রভো ! আমায় বল, কি উপায়ে ইহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে"। মা যে জন্য সাধ করিয়া জগতের মা হইয়াছেন, এই স্থানে আসিয়া তাহার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। জগতের দুঃখ দেখিয়া জগজ্জননীর প্রাণ আগে কাঁদিয়াছে। নিত্য-নির্ব্বিকারা হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ, অপারকরুণার উত্তালতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। মা ! এ ব্রহ্মাণ্ডে তুমি বিম্বস্বরূপিণী, বিশ্ব তোমার প্রতিবিম্ব, তুমি মায়াদর্পণে আপন মুখ আপনি দেখিয়া আপন প্রেমে আপনি বিভোর হও—যে দিন হইতে জগতের দুঃখ দেখিয়া তোমার ঐ চিরানন্দ বদনমণ্ডলে করুণাময়ী বিষাদচ্ছায়া দেখা দিয়াছে, সেই দিন হইতে তোমার সাধের সংসারে সন্তান সন্ততির মুখেও তোমার স্নেহের বিরহচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। মাতৃহারা জগৎ, সেই দিন হইতে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বুঝিয়াছে। দুর্গম সংসারসঙ্কটে পড়িয়া, দুস্তর ভবাম্ভোধির তরঙ্গ দেখিয়া, করাল কাল যন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হইয়া, বিশ্বসন্তান সেই দিন হইতে তোমায় "দুর্গা তারা কালী" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে—ধন্য দয়াময়ীর দয়ার স্রোত, ধন্য করুণাময়ীর করুণার তরঙ্গ ! ধন্য মায়ের অপার স্নেহ ! সেই দিন হইতে তোমার স্নেহের অনন্ত স্রোত জীবের শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, প্রাণে ২ প্রবাহিত হইয়াছে। তাই মা ! আজ্ আমার মত ঘোর নারকী মহাপাতকীও বিপদে পড়িলে সকল ভুলিয়া মায়ের নাম ভুলিতে পারে না। বিপদের বিভীষিকা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেই কে যেন

অন্তর হইতে প্রাণের কবাট খুলিয়া দেয়। অমনি " জয় জয় জয় তারা " ধ্বনি বিশ্বপ্রাঙ্গন পূর্ণ করিয়া তুলে। জানি না, সে ধ্বনি অন্যে শুনিতে পায় কি না। কিন্তু মা! তুই ত নাদবিন্দু—ধ্বনিময়ী, তুই আর ধ্বনি শুনিবি কি? তুই শুনিস্ বা না শুনিস্, আমি ত শুনিতে পাই মা! আমার সেই " জয় তারা " ধ্বনির সঙ্গে ২ " মাভৈঃ মাভৈঃ " রবে প্রতিধ্বনি দিয়া উঠে, সে মা কে মা? ধন্য মা! তোর অনন্ত লীলা! তুই জানিস্ আর বাবা জানে!!!

যখন রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হয়, অমনি 'মা' বলিয়া আরোগ্য পাই। কিন্তু কুপথ্যের নিত্য সেবায় আবার যে রোগ বাড়িয়া উঠে। সংশয় সন্দেহ বিতর্ক আসিয়া আবার যে, হৃদয় আক্রমণ করে। আজ্ কাল্ আমাদের সেই সান্নিপাতিক বিকারের প্রলাপেই কর্ণ জ্বর জ্বর। যে দিকে যাই, সেই দিকেই শুনিতে পাই, " বেদ থাকিতে আবার তন্ত্র কেন? " বিকার যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সময় যে ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাহাত রোগী বুঝিতে চায় না। এ দিকে, বৈদ্যনাথের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব ভাণ্ডার খুঁজিয়া খুঁজিয়া রসায়নের ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্য সময়ে বিষ, বিষ হইলেও বিকারক্ষেত্রে তাহা অমৃত। নির্ব্বিকার শরীরে বিষ শমনের দূত, কিন্তু বিকারে তাহাই আবার সঞ্জীবন-মহামন্ত্র। সাধক! তাই, তন্ত্রে তোমার আমার জন্য তীব্র শক্তি-জ্বালাময় মন্ত্র সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন ঔষধে, কোন সাধনায় যখন ফল হয় নাই, তখনই তন্ত্র শাস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছে। কেননা শাস্ত্রের ভাণ্ডারে তন্ত্রের পর আর সাধন নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন " তাল বৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে " মলয়াচল হইতে যখন সবেগে দক্ষিণানিল বহিতেছে, তখন আর তালবৃন্ত ব্যজনের প্রয়োজন নাই। সাধনা বা উপাসনা বলিলেই তুমি আমি বুঝিয়া থাকি, যেন বসন্তরোগের ভয়ে গায়ে টীকা দেওয়া। জন্মের মধ্যে এক দিন দিলেই হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গলা টীকা দিতাম, আজ্ কাল না হয় ইংরাজিই দিলাম। পূর্ব্বে

বেদ তন্ত্র পুরাণ দেখিয়া সাধন ভজন করিতাম। আজ্ কাল্ না হয়, বাইবেল দেখিয়া কোরাণ দেখিয়াই করিলাম। তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি আর কিছুরই নাই, যাহা কিছু ক্ষতি জীবনের। ধর্ম্ম যাহাদের বিষ্টি ভোগ, (ব্যাগার দেওয়া) তাহাদের পক্ষে উহাই যথেষ্ট, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া দেখিতে চায়, ধর্ম্মময় সূক্ষ্মদর্শনে অতীন্দ্রিয় পদার্থের উপলব্ধি করিতে চায়, তাহাদের ত প্রতিজ্ঞা মরণান্ত, উদ্দেশ্য সিদ্ধি পর্য্যন্ত, গমন ব্রহ্মলোকান্ত, গন্তব্য ব্রহ্মান্ত। জগদম্বার সেই চন্দ্রশেখর-চূড়াচুম্বিত চরণাম্বুজ যাহাদের চরম লক্ষ্য, পার্থিব জীব! বুঝিয়া লও, এই ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া তাহাদিগকে কোন্ সর্ব্বোচ্চ ধামে আরোহণ করিতে হইবে। এই মহাসিদ্ধি জীবের সাধনার পূর্ণসম্পত্তি, বিনা সাধনায় সেই ভবারাধ্য সাধ্য ধন কেহ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। আবার সাধনা তাহারই নাম, যাহার পরিণাম সিদ্ধি। সেই সিদ্ধি চাহিলেই আমাকে সাধনা করিতে হইবে। সাধনা সাধুর কার্য্য, সাধনা করিতে হইলেই আমাকে সাধু হইতে হইবে, অথবা সাধনা করিলে আমি আপনিই সাধু হইয়া যাইব। কায়িক বাচনিক মানসিক ভেদে সেই সাধনা ত্রিবিধ। যাহা কিছু সিদ্ধি ও সাধনা, দেশ কাল পাত্রানুসারে তাহা আমার এই শরীর, এই মন, এই ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে, এই বর্ণসঙ্কর-ম্লেচ্ছ-যবন-বিধর্ম্মি-বিপ্লাবিত দেশে, অনাচার-কদাচার-অত্যাচার-ব্যভিচার-স্বেচ্ছাচার-সঙ্কুল কলিকালে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ-ক্ষেত্র আমার এই অপবিত্র দেহে, চঞ্চল ইন্দ্রিয়ে, সন্দিগ্ধ হৃদয়ে, ঊর্দ্ধসংখ্যা শতবর্ষ পরমায়ু-পূর্ণ প্রাণে, যাহা ঘটিয়া উঠিবে, তাহাই আমার সার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি। এই সম্পত্তি লইয়াই ভবের হাটে আমার যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয়। ইহার মধ্যেই মূলধন রক্ষা করিয়া লাভের অংশ দেখিতে হইবে। এখন বল দেখি, দ্বাদশ বার্ষিক, শত বার্ষিক, সহস্র বার্ষিক যজ্ঞ ব্রত সম্পাদন কে করিবে? তাহার—মন্ত্রজ্ঞ বৈদিক হোতা ঋত্বিক অধ্বর্য্যু আচার্য্য কোথায় পাইব?

বেদের সহস্র সহস্র শাখার মধ্যে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দুই চারিটি ভিন্ন সমস্ত শাখা লোপাপন্ন, আজ্ তাহার কোন্ শাখার কোন্ মন্ত্র পাঠ করিয়া কে কোন্ স্বর্গস্থ দেবতাকে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত করিয়া দিবে? সেই দৈনিক লক্ষ লক্ষ সমিৎ পুঞ্জের সংগ্রহ আজ্ কোথা হইতে হইবে? দৈনিক দশ সহস্র গোহত্যা যে ভারতবর্ষের রাজধানীর নিত্য কৃত্য, আর কি সেই ভারত বর্ষ হইতে স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় পয়স্বিনী গাভীগণের দুগ্ধস্রোত ঘৃতস্রোত প্রবাহিত হইবে? আর কি যজ্ঞীয় পশুর পর্ব্বতাকৃতি পবিত্র মাংসে মন্ত্রপূত আহুতির সংযোগে দেদীপ্যমান হুতাশনের তর্পণ সাধন হইবে? আর কি প্রতি যজ্ঞ কুণ্ডমধ্য হইতে ভৈরব-জ্বালাবলী-সঙ্কুল বহ্নিস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া জটাজুট-বিমণ্ডিত-শ্মশ্রুল-মুখমণ্ডল স্রুক্-স্রুবধারী ব্রহ্মতেজোময়মূর্ত্তি ভগবান্ বৈশ্বানর "বরং বৃণু" বলিয়া যজমানের সম্মুখে দাঁড়াইবেন? আর কি যজ্ঞবিঘ্ন-ভয়ভীত রাক্ষসাসুরবিদ্রাবিত ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ ভবন শূন্য করিয়া যজ্ঞ রক্ষার্থ ধরা ধামে অবতীর্ণ হইবেন? আর কি যজ্ঞাগ্নি হইতে শুকদেবের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী, দ্রৌপদীর ন্যায় মহাশক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন? আর কি যজ্ঞভয়ে কম্পিত কলেবর নাগরাজ তক্ষক, দেবরাজের শরণাপন্ন হইবেন? আর কি তক্ষক সহ সহস্রাক্ষ ব্রাহ্মণের তেজোবলে মন্ত্রের অদ্ভুত প্রভাবে ব্যোমকক্ষে ঘুরিতে ২ যজ্ঞকুণ্ডে পতনোন্মুখ হইবেন? ভারত আজ্ সে তপোবল বিক্রম হারাইয়াছে। আর সে বিশ্বাস নাই, বল নাই, ধৈর্য্য নাই, সাহস নাই, কি কুক্ষণে কাল সর্পসত্র আরম্ভ হইয়াছিল, সেই যে পূজিত বহ্নি অপূজিত হইয়া ভারতের প্রতি বিরূপাক্ষ হইলেন, তক্ষক সহিত দেবরাজকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া সেই যে মন্ত্রশক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিমুখ হইলেন, আজ্ও হইলেন, কাল্ও হইলেন। সে দিন আর ফিরিয়া আসিল না। জন্মের মত যাজ্ঞিক জগতের শেষ যবনিকাপাত হইল, আর উঠিল না। কি জানি কলিযুগের সংস্পর্শের কেমনই দোষ, দেবতা মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং উপকরণ সমস্ত পূর্ণ

প্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিতেও যজ্ঞ পূর্ণ হইল না। যজ্ঞেশ্বরীর এ লীলা-রহস্য কে বুঝিবে ? তাই বলিতেছিলাম, কলির জীব ! মহারাজ পরীক্ষিৎ, জনমেজয় যেখানে পশ্চাৎপদ, সেখানে তুমি আমি অগ্রসর হই, কোন্ সাহসে ? আর, হইলামই বা অগ্রসর, তাহাতেই কি সকলে সুখী। সুখৈশ্বর্য্য স্বর্গভোগ যাহাদের কামনা, যজ্ঞ তাহাদেরই সাধনা। যাহারা সুরত্ব ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করিয়া, সেই শঙ্কর-সম্পদ পদের ভিখারী, তাহারা কি আর তোমার যজ্ঞের প্রলোভনে মুগ্ধ হয় ? তাহাদের উপায় কি ? কোন্ সাধনায় তুমি তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবে ? বলিবে, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান ধারণা সমাধি, তত্ত্বজ্ঞান লাভের এ সকল উপায় ত বৈদিক পথে রহিয়াছে। আছে সত্য, সমুদ্রে রত্ন আছে, তাহাতে তোমার আমার কি ? রাবণের মত যাজ্ঞিক রাজা কে হইবে, যে, বরুণদেব রত্নাকরের সকল রত্ন উদ্ধার করিয়া তাহাকে উপহার দিবেন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জাবালি জনক জৈমিনির মত তাপস—রাজ্য-সম্রাট্ কে জন্মিবে ? যে, ভগবান্ বেদ-সাগর-গর্ভ মন্থন করিয়া নিখিল তত্ত্বজ্ঞান তাহার করে অর্পণ করিবেন। নচিকেতার মত ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন দিব্যদেহ কে লাভ করিবে যে, যমালয়ে গিয়া যমের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাইবে। "নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ" গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশান কার্য্য পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ব্যাপার বেদমন্ত্রে সমাহিত হইবে, সে আর্য্যজীবন আর নাই। বৈদিক নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফূর্ত্তি পাইবার উপযুক্ত সংযতেন্দ্রিয় দিব্যদেহ এক্ষণে অসম্ভব বলিলেও আর অত্যুক্তি হয় না। বলিতে কি, সে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পরব্রহ্ম সমাহিত নির্ব্বিকল্প হৃদয়ে কেবল দৈবতেজঃসম্পন্ন পুত্র-কামনায় ঋতুকালে এক বারের জন্য ধর্ম্ম-পত্নীতে উপগমন আর নাই ? শত শত পুরুষানুক্রমে যবন-দাসত্বলব্ধ অন্ন উদরসাৎ করিয়া সে ব্রহ্মতেজ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তপোমন্ত্রানুভাবিত সে পবিত্র শুক্র-

শোনিত আর নাই। সে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী পিতা মাতাও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, সেই অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ভিত্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞান সৌধশিখর স্থাপিত করিবার দিন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনকে প্রকৃতি লীন করিয়া মুদ্রিত নয়নে সে পরব্রহ্ম ধ্যান আর নাই। আজ্ সেই ধ্যানের ভান করিয়া যাহারা নয়ন মুদ্রিত করিতে যায়, দেখিবে তাহাদের সেই মুদ্রণের মধ্যেও স্পন্দন আছে, অন্ধকারেও মিটি মিটি দর্শন আছে। এ ত সংযমের অভিনয় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা যথার্থই ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়াছেন, কেবল চিরাভ্যাসবশতঃ অন্তঃকরণ হইতে সংস্কাররাশি বিদূরিত হয় নাই—গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ তাঁহাদিগকেও বলিয়াছেন "কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্, ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে" কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহকে যে মনে মনে স্মরণ করে, সেই বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে" এতদূর যাহার কঠোর শাসন, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা, সেই পথে তুমি আমি উত্তীর্ণ হইব, ইহা কি দাম্ভিকতার কথা নহে? দ্বাপরের উপান্ত, কলির প্রারম্ভ, এই যুগ সন্ধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষাৎ নর নারায়ণের অবতার অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তর্জনী নির্দ্দেশ করিয়া যে তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয় বলিয়া, যে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি তত্ত্বজ্ঞান, অর্জ্জুনের হৃদয়াধিকৃত করিতে পারেন নাই, আজ্ তুমি আমি সেই কলিযুগের পূর্ণাধিকারে ঘোরান্ধকারে ডুবিয়া যোগবাশিষ্ঠ গীতা পড়িয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব, ইহা যদি তোমার জাগ্রদবস্থা হয়, তবে স্বপ্ন কাহার নাম তাহা ত জানি না।

আমরা চক্ষের উপর বিলক্ষণ দেখিতেছি, আজ কাল্ দিনে দুই প্রহরে এই স্বপ্ন দেখিয়া অনেক আধ্যাত্মিক পুরুষ বৈদিক পথে যোগী হইতে গিয়া শেষে, না আস্তিক, না নাস্তিক, সেই এক এক অদ্ভুত

নরসিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া বসিয়া আছেন। ধূঁয়ো ধূঁয়ো আকাশ চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় এমন শূন্য হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে না আছে বিশ্বাস, না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি, না আছে প্রেম, আছে কেবল কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ়তা, আর মনে মনে " হা হতোস্মি " আর্ত্তনাদ। অনেক স্থানে দেখিয়াছি, তাঁহারা গোপনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, " এখন উপায় কি ? " অনুপায় তাঁহাদের আর কিছুই নহে—অর্থাৎ লোকের সাক্ষাতে শিখা সূত্র না রাখিয়া, ফোঁটা তিলক না দিয়া, বাহিরে ব্রহ্মজ্ঞানের ঠাট বজায় রখিয়া ভিতরে ভিতরে তান্ত্রিক বা পৌরাণিক মতে উপাসনা করিলে হয় কি না, ইহাই তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য। মনে কর, এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে পরমায়ু শেষ করিয়া শেষে এই অনুতাপ কি শোচনীয় দশা নহে ? ব্রহ্মদ্বারের নিষ্কণ্টক সোপানরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শেষে এই অপমৃত্যু মরিতে হইবে, ইহা জানিয়াই কোটি কোটি বর্ষ পূর্ব্বে অন্তর্যামিণী তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কি করিব, ঐ যাহা বলিয়াছি—কুপথ্যের নিত্যসেবায় আবার রোগ বাড়িয়া উঠে ; তাই সঙ্গীতসাধক কাঁদিয়া বলিয়াছেন " দোষ কার নয় গোমা ! আমি, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ! " সেই মরণই কি সহজ ? শত যমদণ্ড হইতেও যেন অনুতাপের যন্ত্রণা অধিক অসহ্য। আসন্ন মৃত্যুর সেই বিকট বিভীষিকা স্মরণ হইলে কঠিন পাষাণ হৃদয়ও বিদ্রাবিত হইয়া উঠে, মুমূর্ষুর মলিন মুখমণ্ডল বিপ্লাবিত করিয়া সে অজস্র অশ্রুধারা নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন অনিবার্য্য বেগে অন্তরের অন্তঃস্তর ভেদ করিয়া রোদনের উৎস ছুটিতে থাকে—

" মা গো ! কি করিব বল্ !

দিনে দিনে ব্যাধি হলো, যে প্রবল্।

পিত্ত সত্ত্ব, বায়ু রজঃ, কফতমঃ, ত্রিদোষ ক্ষেত্রে বিপদ্ ঘটিল বিষম, এবার, বিকার সন্নিপাত, (মা গো) আমার সন্নিপাত, কাঁদি তাই অবিরল্।

এই আর্ত্তনাদপূর্ণ অবিশ্বস্ত অন্তিমজীবনে শম দম অসাধ্য, সমাধি অসম্ভব, অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বস্ফূর্ত্তি সুদূরপরাহত ; সুতরাং এ অবসন্ন দেহ লইয়া সে দুর্গমপথ-যাত্রাও আমার পক্ষে দুর্ঘট। যে বৃক্ষের অগ্রশাখা অবলম্বন না করিলে ফল পাইব না, তাহার মূল মাত্র স্পর্শ করিয়া বৃক্ষকে নিষ্ফল মনে করা আর বৈদিক পথে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান না পাইয়া বেদকে নিষ্ফল মনে করা একই কথা! বরং বৃক্ষস্পর্শ না করিয়াও যদি তাহাতে ফলের অস্তিত্ব বিশ্বাস থাকে, তবে তাহার ছায়াতে বাস করিলেও এক দিন না এক দিন অবশ্য ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। যাহার অগ্রশাখাস্পর্শ না করিলে ফল পাইব না, তাহার মূল পর্য্যন্তও স্পর্শ না করিয়া কেবল বিশ্বাসের নির্ভরে তরুতলে বসিয়া থাকিলেই কোন দিন না কোন দিন অবশ্য ফল পাইব—এ রহস্য ভেদ করা যেন কিছু কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা বলি, শুনিতে কঠিন হইলেও কার্য্যতঃ কঠিন নয়। অনেক অনেক আঢ্য ধনী ভূস্বামীর গৃহোদ্যানে দেখিতে পাই, সায়াহ্ণ সমীরণ সেবনের জন্য পিতা মাতা হয়ত নিজবালক বালিকার অঙ্গুলী ধারণ করিয়া সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, উদ্যানের কোন একটি বৃক্ষ পরিপক্ক ফল সমূহে সুসজ্জিত হইয়া আছে। চঞ্চল বালক বালিকার হৃদয় ফলের লোভে কেমন ব্যতিব্যস্ত হয়, ইহাই দেখিবার জন্য কৌতুক সহকারে তাঁহারা কুমার কুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঐ দেখিয়াছ, গাছে কেমন সুন্দর ফল পাকিয়াছে। পিতা মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে যেমন দৃষ্টি পাত, বড়লোকের ঘরের আদুরে আব্দারে ছেলে মেয়ে আর কি তখন থাকিতে পারে? "দাও দাও দাও" বলিয়া ক্ষণার্দ্ধের মধ্যে কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। পিতা মাতা তাহার পরেও কৌতুক দেখিবার জন্য বলিলেন, যাও গাছে উঠিয়া পাড়িয়া আন। কিন্তু তাহারা জানে " আমরা পাড়িতে পারিব না, " তাই এ ব্যঙ্গ শুনিয়া আরও অভিমানে জ্বলিয়া উঠিল। দুই জনে কঁদিয়া যখন মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া পড়িল

দেখিয়া স্নেহময়ী মায়ের প্রাণ গলিল, পতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর কেন ? এখন উপায় কর, তখন পিতা মাতা দুই জনে দুই জনকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বৃক্ষশাখার সমকক্ষে দণ্ডায়মান করিয়া ধরিলেন। কুমার কুমারী পিতা মাতার হস্তে নির্ভর করিয়া স্বহস্তে সেই বাঞ্ছিত ফল চয়ন করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাই বলি, বড় লোকের ঘরের আদুরে ছেলে মেয়ের এ আব্দার অসম্ভবও নহে, অপূর্ণও থাকে না। সাধক ! এ জগতে তুমি কোন্ রাজাকে কোন্ রাণীকে সকলের বড় বলিয়া জান ? ত্রিভুবন-রাজরাজেশ্বরের নিকটে আর রাজা কে ? আর সেই উপেন্দ্র-সুরেন্দ্র-বন্দিত-চরণা যোগীন্দ্রমহিষীর নিকটে রাণীই বা কে ? তুমি আমি সেই পিতা মাতার সন্তান, আমরা ছোট কিসে ? কিসে আমাদের আদর আব্দারের সোহাগের ত্রুটি আছে ? এ সংসার প্রমদবনে বেদ-বৃক্ষের মোক্ষ ফল দেখিয়া যে দিন জীব কাঁদিয়া অধীর হইয়াছে, যেদিন জগজ্জননী দেখিয়াছেন, এ দুর্ব্বল বালক বালিকা ঐ দুরারোহ বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিবে না, সেই দিনই সদয়হৃদয়ে দেবদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আর আমোদ দেখিওনা, শীঘ্র উপায় কর। উপায় আর কি করিবেন ? ত্রৈলোক্য-জনক জননী অমনি আগম নিগম উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বিশ্বনরনারী কুমার কুমারীকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ধরিয়াছেন। তাহারা পিতা মাতার হস্তের উপর নির্ভর করিয়া সেই যোগিজন-দুর্লভ বেদবৃক্ষের মোক্ষফল স্বহস্তে চয়ন করিতেছে। সাধকগণ বেদবৃক্ষে আরোহণ না করিয়াও তন্ত্রশাস্ত্রের মন্ত্রবলে বেদের ফল কৈবল্যসিদ্ধি অনায়াসে লাভ করিতেছেন। সকল সময়ে এত দয়া হয় কি না, তাহা জানি না, সায়াহ্নসমীরণ-সেবনে ত না হইলেই চলে না। সূর্য্যদেব অস্তে চলিলেন, সম্মুখে প্রগাঢ়তমোময়ী ভীষণযামিনী, এ সময়ে ঘোর অন্ধকার বনমধ্যে মা কি সন্তানকে একাকী রাখিয়া যাইতে পারেন ? মায়ের এক দিবসের

তিন প্রহর, সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলিয়া গিয়াছে, শেষ প্রহর কলি, তাও যায় যায়। কলির জীবের পরমায়ু সূর্য্য আর কতক্ষণ থাকিবেন, তিনিও অস্তোন্মুখ, সম্মুখে নিবিড়তামসী মৃত্যুময়ী যামিনী। এ ঘোর-সঙ্কট সন্ধ্যাকালে মহাকালহৃদয়রঞ্জিনী ভবভয়ভঞ্জিনী মা কি আমাদিগকে একাকী রাখিয়া যাইবেন? তিনি যখন তাঁহার সেই মণিদ্বীপমধ্যস্থিত পারিজাতমণ্ডিত চিন্তামনিমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন, জননীর অঞ্চলসম্বল বালক বালিকার দলও তখন চঞ্চলচরণে মায়ের সঙ্গে ২ নিত্যধামে প্রবেশ করিবে। মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী, মা আমাদের করুণাময়ী, তাই আমাদের এত সোহাগ, এত অহঙ্কার, এত অভিমান, মাকে লইয়া যে অভিমান, তাহা ত্যাগ করিতে পারিব না, এ অভিমান ছাড়িয়া দিলে মায়ে পোয়ে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, তাই ইহা জীবন থাকিতে ছাড়িতে পারিব না—এ অভিমান প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া রাখিব, মরণেও তাঁহার চরণে ইহা উপহার দিব। "আমরা মায়ের, মা আমাদের" এই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জপ করিতে করিতেই সংসার হইতে বিদায় লইব। মায়ের প্রসাদে মায়ের সন্তান সাধকের ইহাই ইহলোকের পরলোকের চিরবিজয়বৈজয়ন্তী। সাধক জানেন, মন্ত্রতন্ত্রস্বরূপিনীর এ মন্ত্রময় স্বতন্ত্রলীলা বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর, বড়ই মনঃপ্রাণবিমুগ্ধকর!!!

অদ্বৈত বাদ।

স্থানে স্থানে কত গুলি অদ্বৈতবাদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে "শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান বা অদ্বৈত, সিদ্ধি, বেদান্ত ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কেহ কখন লাভ করিতে পারে না, এবং শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত অদ্বৈত তত্ত্বের আচার্য্যও আর কেহ হইতে পারে না", ইঁহারা যদি নিজে বেদান্তমতসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া এ কথা বলিতেন; তাহা হইলেও আমাদের এক দিন বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সেই সকল বাক্যই তাঁহাদের

তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষী। বৈদান্তিক মত ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অদ্বৈত-সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহা তাঁহারা কোন্ প্রমাণ অনুসারে স্থির করিলেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হইতে পারে, তাঁহাদের এমন বিশ্বাস আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তত্ত্ব-বোদ্ধা সংসারে আর কেহ নাই, কেননা "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার। সে কথা আমরাও অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রচারিত বেদান্তদর্শন ভিন্ন আর কিছুতে তত্ত্বজ্ঞান-সিদ্ধি হইবে না, ইহার প্রমাণ কি? শঙ্করাচার্য্যের মত পুরুষ, তুমি আমি হইতে পারি না কিন্তু যাঁহার অবতার বলিয়া শঙ্করাচার্য্য গৌরবিত—পূজিত, তিনিও কি হইতে পারেন না? শিবাবতার যাহার প্রচারক, স্বয়ং শিব কি সে তত্ত্বের অনভিজ্ঞ? স্ফুলিঙ্গে সংসার ছার খার হইয়া যায়, অথচ অগ্নিতে দাহিকা শক্তি নাই, ইহা বিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? ফলতঃ বেদান্ত দর্শনে অদ্বৈততত্ত্বের অবিষ্কার মাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহার সমন্বয় হইয়াছে তন্ত্র শাস্ত্রে। এই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈত-বাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কত শত যোগী ঋষি সাধু সাধক হত আহত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। তন্ত্র শাস্ত্রে ভগবান্ ভূতভাবন প্রকৃতি বিকৃতির সমন্বয় করিয়া সেই দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধ যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, শান্তিকে তাহারা চিরকালই উপসর্গ বলিয়া মনে করে। তাই আজও পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে অনেক অদ্বৈতবাদীকে তন্ত্রবিরোধী দেখিতে পাই। শিবের সহিত জীবের বিরোধ, এ কথা শুনিলে আমাদের কিন্তু হাঁসিও পায়, লজ্জাও হয়। দার্শনিকের চক্ষে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়কে দেখিলে যেন পূর্ব্বাপরসমুদ্রবৎ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এক দিকে অদ্বৈতবাদ বলিতেছেন, সংসার কেবল মরুমরীচিকা, মায়াতরঙ্গ, রজ্জুসর্প, শুক্তিরৌপ্যবৎ অজ্ঞানবিজৃম্ভন মাত্র। জ্ঞানরূপী নিত্য শুদ্ধ নিগু'ণ ব্রহ্ম অজ্ঞানের অতীত, গুণের অতীত, সংসারের অতীত। তাঁহার ইচ্ছা নাই, ক্রিয়া নাই, চেষ্টা নাই, ফলভোগ নাই, নাই

বলিতে কিছুই নাই, আছেন কেবল " তিনি " মাত্র। অন্য দিকে দ্বৈত-বাদ বলিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা আছে, ক্রিয়া আছে, চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, ফলভোগ আছে—আছে বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই তাঁহাতে আছে। নাই কেবল " নাই " এই শব্দটি। উভয়ই শাস্ত্র, কাহারও বলাবলের লাঘব গৌরব নাই, উভয়ই সমান প্রমাণ। কে কাহাকে পরাস্ত করিবে? উভয়েরই সাক্ষীও ভগবান্, বিচারকও ভগবান্। লৌকিক মানব দ্বারা ইহার মীমাংসা অসম্ভব, তাই ত্রিলোকসন্দেহভঞ্জন জন্য সর্ব্বান্তর্যামিনী নিজে প্রশ্নকর্ত্রী সাজিয়াছেন এবং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্ব-মঙ্গলাবল্লভ তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, স্বয়ং নারায়ণ তাহাকেই স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

" আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতম্ "॥

শিববক্ত্রবৃন্দ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত, এবং বাসুদেবের অভিমত, এই তিন কারণে, আগত গত ও মত এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া তন্ত্র শাস্ত্রের নামান্তর আগম। যে অংশের প্রশ্নকর্ত্রী পার্ব্বতী, উত্তরদাতা মহেশ্বর, সেই অংশের নাম আগম। আবার লীলামাধুর্য্য-সম্বর্দ্ধন জন্য যে অংশে মহাদেব প্রশ্নকর্ত্তা এবং মহেশ্বরী উত্তরদাত্রী সেই অংশের নাম নিগম।

" নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমস্তেন কীর্ত্তিতঃ "।

গিরিজাবক্ত্র হইতে নির্গত, মহেশ্বরের পঞ্চমুখে গত, এবং বাসুদেবের সম্মত। এ স্থলেও নির্গত গত ও মত এই শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর লইয়া নামান্তর নিগম। তন্ত্রশাস্ত্র, এই আগম নিগম রূপ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত, তন্ত্রের বক্তা এবং বক্ত্রী ভগবান্ ও ভগবতীর যেমন স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তাঁহাদের উক্তিরূপ আগম নিগমেরও তদ্রূপ স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, উভয়েরই জীবনিস্তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং দ্বৈতজগতের মধ্য দিয়া অদ্বৈত তত্ত্বে গতি বিধিই ইহার

প্রক্রিয়া। অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতঃ সত্য হইলেও দ্বৈতদৃশ্য সংসারে আপামর সাধারণের হৃদয়ে তাহার অনুভব অসম্ভব, এই জন্য স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সহস্র সহস্র শিষ্যপরম্পরায় অদ্বৈত-তত্ত্ব দিগ্ দিগন্তে প্রচারিত হইলেও তাহা গন্তব্য পথ বলিয়া সাধারণ্যে গৃহীত হয় নাই। যাঁহারা সেই অদ্বৈত পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ এক জন যদি নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে নিজ ধামে পৌঁছিয়া থাকেন, তবে সেই যথেষ্ট। এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যপ্রচারিত অদ্বৈতপথ বলিতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাহা তান্ত্রিক-অনুষ্ঠানাদিবিরহিত এবং কেবল বেদান্তমতসিদ্ধ, তাহাই শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈত পথ। আমাদের কিন্তু বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সহিত বা রহিত তাহা আমরা এক্ষণে কিছু বলিতে চাই না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে "নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাং"

এই তীব্র বৈরাগ্যবেগে আক্রান্ত যে পথ, তাহাই তাঁহার নিজ-প্রচারিত অদ্বৈত পথ। লক্ষ মানবের মধ্যে এক জন কখনও এ পথে সিদ্ধ হইয়াছেন কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে অদ্বৈত বাদী কেহ আছেন কিনা জানি না, থাকুন্ আর নাই থাকুন্, দণ্ডীর মঠে, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে, মহন্তের আখড়ায় এমন লোক এখনও অনেক আছেন, যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের দোহাই দিয়া অদ্বৈত বাদের অভিমান করিয়া থাকেন, ইঁহাদের কথা বলিবার এক্ষণে সময় হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় যাঁহারা দার্শনিক মতে জগদ্বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক এবং এখনও যাঁহারা বেদান্ত দর্শনে অলৌকিক বিচার-শক্তির পরিচয়ে নৈয়ায়িক নাস্তিক প্রভৃতি মত খণ্ড খণ্ড করিয়া গুরু-সম্প্রদায় বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহারা দার্শনিক জগতে গুরু হইলেও অদ্বৈত তত্ত্বে কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাধকগণ তাঁহাদের পরমত—খণ্ডন এবং স্বমত সংস্থাপন দেখিয়াই তাহা বুঝিয়া লইবেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বৈতজ্ঞান যাঁহার নাই, তিনি কেমন করিয়া বদ্ধপরিকরে

নৈয়ায়িকের সঙ্গে বিচার করিতে যান, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দর্শন শাস্ত্রের কূট বিচারশক্তি, আর সাধনালব্ধ অদ্বৈতসিদ্ধি, দুই এক পদার্থ নহে। বিচার যাঁহার রহিয়াছে, অদ্বৈতসিদ্ধি তাঁহার অনেক দূরে। স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গে যে পরিমাণ দ্বৈতবাসনার বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, দার্শনিকের সংসর্গে বিচার করিতে যে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অতিরিক্ত না হয় এ কথা কে বলিল? যাহা হউক এই সকল দার্শনিক দণ্ডিগণকে আমরা বিচারে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রণাম করিতে বাধ্য, কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধ বলিয়া এঁারা হেলায়িত করিতেও কুণ্ঠিত। যাঁহাদের গুরু বর্গের বিবরণ এই, সেই শিষ্যসম্প্রদায়ের সিদ্ধিবৃত্তান্তের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বৈরাগ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবার অধিকার এ সংসারে অতি বিরল, তাই দ্বৈত-জগতের প্রতিকূলে অদ্বৈতসিদ্ধি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদান্তপথিক অদ্বৈতবাদিগণও ইহা জানেন যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিলে তবে অদ্বৈত জ্ঞান-সিদ্ধি হইবে। নতুবা অদ্বৈতবাদে সমস্তই যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হওয়া ও অসম্ভব। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ইহা দ্বৈতবাদেরই কথা। অদ্বৈত পথে যাইতে হইলেও আমাকে যেমন প্রথমতঃ এই দ্বৈতপথেই মস্তক অবনত করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। নতুবা যেরূপ গুরু ব্যতিরেকে কখনও সিদ্ধি সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ তন্ত্র শাস্ত্রও অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—যদি ঐ অদ্বৈত পথের আশা থাকে, তবে এই দ্বৈত-জগতের মধ্যে দিয়াই যাত্রা করিতে হইবে। দ্বৈতজগৎ উল্লঙ্ঘনের জন্য উল্লম্ফন দিও না। অনেক মহা মহারথী বীর এই রূপ উল্লম্ফন দিয়া পরিশেষে পঙ্গু হইয়াছেন। পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে শীঘ্র উঠিতে হইবে ইহা জানি। কিন্তু তাই বলিয়া আকাশে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া উড়িবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যাঁহারা ভুজবল-মদোন্মত্ত হইয়া

এই রূপ চেষ্টা করিয়াছেন, পরিণামে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদেরই অস্থিসন্ধি চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া গিয়াছে। শেষে নির্বিণ্ণ-হৃদয়ে তাঁহারাই বলিয়াছেন, "অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরুন্মূলনাদপি। অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো! বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ"। মহা সমুদ্রের সমস্ত জল পান যদি সম্ভবে, সুমেরু পর্ব্বতের উন্মূলন যদি সম্ভবে, অগ্নিভোজন যদি সম্ভবে, তবে, হে সাধো! চিত্তনিগ্রহ তাহা অপেক্ষাও বিষম কঠিন। পরিশেষে এই শোচনীয় দশা হইতে, এই আর্ত্তনাদ হইতে, সাধককে রক্ষা করিবার জন্যই তন্ত্র শাস্ত্রের অবতারণা। তাই তন্ত্রে এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ দ্বৈত জগৎকে প্রথমেই উপেক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই। সুদূরস্থিত পর্ব্বত শিখরে অরোহণ করিতে হইলে যেমন এই পৃথিবীতেই পদক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে, তদ্রূপ অদ্বৈততত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলেও ধীরে ধীরে দ্বৈত জগতের মধ্য দিয়াই প্রস্থান করিতে হইবে। দ্বৈত জগৎকে চিরকাল সাধনার শত্রু বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে অদ্বৈত সিদ্ধি সুদূরপরাহত। তন্ত্রশাস্ত্র সেই দ্বৈতজ্ঞানকে সাধনার শত্রু না বলিয়া, মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধক সেই দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানকে সন্তানরূপে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের পরস্পর প্রেমলীলা দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। দ্বৈত জগৎ মন্থন করিয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে ডুবিয়াছেন, দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের লীলা মাধুর্য্য তিনিই বুঝিয়াছেন। সংসারের তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়াও তিনি তাহাতে মিশিয়া যান না। পবন হিল্লোলে আন্দোলিত কমলদলের ন্যায় সংসারে থাকিয়াও বিপদে সম্পদে আলোড়িত হইয়াও সুখ দুঃখে তিনি নিত্য নির্লিপ্ত। কিছুতেই তাঁহার পূর্ণানন্দ হৃদয়ে নিরানন্দের মলিন ছায়া পতিত হয় না। তাই সদানন্দ ভক্তানন্দে অধীর হইয়া তন্ত্রে বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈত মিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতাঃ"।

"জগতে কেহ অদ্বৈত জ্ঞান ইচ্ছা করেন, কেহ দ্বৈত জ্ঞান ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের অতীত হইয়াছেন"।

যাঁহারা দ্বৈত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা উড়াইয়া দিতে পারিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাই দ্বৈত জগৎ উড়িয়া যাউক্, বা না যাউক্, তাঁহারা ত উড়িয়াছেন। যে দ্বৈত জগৎকে কিছুই নয় বলিয়া ফূৎকারে উড়াইবে, তাহাকে দেখিয়া এত ভয় কেন ? আর যাহা কিছুই নয়, তাহাকে উড়াইবার জন্য এত চেষ্টাই বা কেন ? অদ্বৈতবাদিগণের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া যে সকল আর্ত্তনাদ বহির্গত হয়, তাহা শুনিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাদিগকে বিভীষিকা দেখাইবার জন্যই দ্বৈত সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। সংসারে শান্তি নাই, প্রেম নাই, আরোগ্য নাই, আনন্দ নাই, আছে কেবল "হা হতোস্মি" ধ্বনি, আর "ত্রাহি ত্রাহি" আর্ত্তনাদ, যেন দ্বৈত জগতের ভয়ে অদ্বৈতবাদ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া পালাইবার স্থান পাইতেছেন না; কোথায় গেলে রক্ষা পাইব, যেখানে যাই, সেই খানেই দ্বৈত জগৎ। দ্বৈত তত্ত্ব লইয়াই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডলীলা। কাহার সাধ্য সেই ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিয়া দ্বৈত-জগৎকে উপেক্ষা করিয়া অদ্বৈত তত্ত্বে উপনীত হইবে ? রাজর্ষি জনক, শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে দ্বৈত জগৎকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তুমি আমি তাহাকে ভ্রূভঙ্গে উড়াইব—ইহা অপেক্ষা ব্যলীকতা আর কি আছে ? অন্যে পরে কা কথা ? সুরাসুরবন্দিতপদ চরাচরগুরু পরমেশ্বর পর্য্যন্ত দ্বৈতজগতের মায়ামোহের অভিনয় করিয়া, যাঁহার মায়া, তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছেন—

তারা—রহস্যে।

"ভূমৌ নিপত্য দেবেশঃ পপাত চরণান্তিকে।
অযুতং দ্বাদশং দেবি পুস্তকঞ্চাবলোকিতং

কলাং বক্তুং ন শক্নোমি বদ যোগং সুরেশ্বরি ।
মাত র্মে কালিকে দেবি ! প্রসীদ ভক্তবৎসলে ।
শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্যাপি হসিত্বোবাচ তারিণী ।
ত্বদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
ইমং যোগং মহাদেব ! ভাবয়স্ব দিনে দিনে ”

দেবদেব, জগদম্বার চরণাম্বুজ সন্নিহিত ভূমিভাগে নিপতিত এবং প্রণত হইয়া বলিলেন—দেবি ! দ্বাদশ অযুত (এক লক্ষ বিংশ সহস্র) পুস্তক অবলোকন করিলাম—তথাপি কলাতত্ত্ব কি, তাহা আমি বলিতে সমর্থ নহি। সুরেশ্বরি ! সেই কলাযোগ আমাকে বল, দেবি ! ভক্ত বৎসলে ! মাতঃ কালিকে ! আমার প্রতি প্রসন্না হও, মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবনতারিণী হাস্যসহকারে উত্তর করিলেন—“ ব্রহ্মাণ্ডের সকল পুরুষ তোমার স্বরূপ, এবং সমস্ত স্ত্রী আমার স্বরূপ ” মহাদেব ! এই যোগ দিনে দিনে অভ্যাস কর ।

সাধক বিশেষ সাবধান হইবেন—এ স্থানে স্বয়ং মহেশ্বরী গুরু, মহেশ্বর শিষ্য। মহাদেব সাধক, মহাদেবী উত্তর সাধিকা, সাধ্য—জগতের স্ত্রী পুরুষ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও স্বয়ং শিব এই জ্ঞানযোগ সাধন করিতে বসিয়াছেন—অন্তর্যামিনী আজ্ শিবের মত শিষ্যকেও সাবধান করিয়া বলিতেছেন—“ ইমং যোগং মহাদেব ভাবয়স্ব দিনে দিনে ” যোগীন্দ্র চূড়ামণি যোগের অনুষ্ঠান করিবেন—তিনিও দিনে দিনে ভাবনা করিয়া এই যোগ অভ্যাস করিবেন। জগদীশ্বর হইয়া জগৎকে উপাসনা করিবেন—তবে তাঁহার হৃদয়ে শক্তিতত্ত্ব পরিস্ফুরিত হইবে । শক্তি-তত্ত্বের সম্যক্ বিস্ফুরণ হইলে, তবে, শিব শক্তির অভেদজ্ঞানে দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড ঘুচিয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ড ঘুচিয়া গিয়া কেবল ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ সত্ত্বের উপলব্ধি হইবে। সাধক এই স্থানে বুঝিয়া লইবেন—কিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে। ইহাতেও এই আপত্তি থাকিতে পারে যে, কেবল স্ত্রী পুরুষ লইয়াই ত জগৎ নহে—

নদ নদী সমুদ্র সরোবর, বন উপবন প্রান্তর পর্ব্বত, পৃথিবী বায়ু আকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডল—এ সকলের লোপ হইবে কিসে ? আমরা বলি, ইহার কিছুরই লোপ হইবে না, সমস্তই থাকিবে—তবে, শক্তি-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হইলে সাধক দেখিবেন, নিখিল বিশ্ব-সংসার কেবল সেই বিশ্বেশ্বরীর বিচিত্র শক্তিবৈভব ভিন্ন আর কিছুই নহে। তখন দ্বৈত জগৎকে আর সাধনার শত্রু বলিয়া বোধ হইবে না, সংসারই তখন সাধনার উপকরণময় সুপ্রশস্ত পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া অনুভূত হইবে। আমরা সাকার উপাসনা এবং শক্তিলীলা পরিচ্ছেদে এ তত্ত্বের সম্যক্ অবতারণা করিব। এ স্থানে তন্ত্রের উপযোগিতা-প্রসঙ্গে ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

অতঃপর অনেকের আশঙ্কা এই যে,—এই নিগূঢ় জ্ঞানযোগ-তত্ত্ব কলুষিত কলিযুগে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি ? এ কথারও সম্যক্ উত্তর করিবার ক্ষেত্র এ নহে—তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিতেছি যে, বিকারগ্রস্ত রোগীকে বিষ দ্বারা রসায়ন করা যেমন উপযুক্ত, আবার রসায়নের পক্ষে রোগীর বিকারগ্রস্ত অবস্থাও তেমনই উপযুক্ত। প্রকৃতির মঙ্গলময়-নিয়মে বিকারের প্রভাবে তাহার শরীরে আজ্ এমন তীব্রাভিভাবিনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, যাহাতে রোগী অনায়াসে বিষপান করিয়া বিষের জীবনবিরোধিকা শক্তি নষ্ট করিয়া তাহার জীবনসাধিকা শক্তি গ্রহণ করিতেছে। তদ্রূপ কলিযুগের বিকার-প্রভাবেও জীবের শরীরে এমন তীব্রশক্তির সঞ্চার হইয়া আছে—যাহাতে যোগী ভৈরবজ্বালাময় তান্ত্রিক মন্ত্র মহৌষধির জীবনবিরোধিকা শক্তির অপলাপ করিয়া সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে ভবরোগ-বিকারগ্রস্ত হইয়াও মৃত্যুঞ্জয়পদবী লাভ করিতেছেন। তাই কলিযুগের পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র যেমন উপযোগী, আবার তন্ত্রশাস্ত্রের পক্ষেও কলিযুগ তেমনি উপযোগী। প্রকৃতিপুরুষময় শিবশক্তিজ্ঞানে অদ্বৈত সিদ্ধি, ইহা তোমার আমার পক্ষে নূতন হইলেও সাধনারাজ্যে নিত্যসত্যসনাতনী দেববাণী। কুলার্ণবে—

শিবশক্তিময়ো লোকো লোকে কৌলং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং কৌলং সর্ব্বসাধারণং কথং।

লোকসংসার নিত্যশিবশক্তিময়, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষবিজড়িত; এ নিগূঢ় তত্ত্ব কাহারও জ্ঞানগোচর হউক্ বা না হউক্, লোকের অজ্ঞাতসারেও লোকসংসারে কৌল ধর্ম্ম চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সার্ব্বভৌম অধিকার হেতু কৌল ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা সর্ব্বসাধারণ হইবে কিরূপে? অর্থাৎ অন্যান্য ধর্ম্মে সিদ্ধ হইলে তবে, যে কৌল ধর্ম্মে সাধনার অধিকার হইবে, তাহা অন্যান্য সকল ধর্ম্মের সমান হইবে কিরূপে?।

তান্ত্রিক সাধকসমাজ এই শিবশক্তিময় প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়াবলেই চিরকাল ভুবনবিজয়ী। এই প্রত্যক্ষপ্রমাণবলে বলীয়ান্ হইয়াই সাধক, শাস্ত্রান্তরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতে চাহেন না। জগন্ময় শিবশক্তিজ্ঞান যাঁহার নিত্যসিদ্ধ—তাঁহার চক্ষে জগৎ একটা অপ্রসিদ্ধ পদার্থ। সুরাসুর নরসমাজে, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, অনন্ত কোটি চরাচরে "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ" "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" এই যাঁহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধি, ব্রহ্মাণ্ডময় পিতা মাতার সোহাগ যে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডেও ধরে না—সেই সোহাগে উন্মত্ত হইয়াই সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে—
এ কথা কি ভাঙ্গ্‌ব আমি হাঁড়ি চাতরে।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে,
অনুজলক্ষ্মণ সঙ্গে [তবু] জানকী তাঁর সমভিব্যাহারে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে,
রাম প্রসাদ বলে, বল্‌ব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে।

দ্বৈতজগতের অভ্যন্তর দিয়া অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র যে নিগূঢ় পথের আবিষ্কার করিয়াছেন, দ্বৈতকে অদ্বৈতে

পরিণত করিয়া, আবার সেই অদ্বৈততত্ত্ব হইতে এই দ্বৈতলীলার অভিনয়ে, যে ব্রহ্মানন্দরসস্রোতে সাধকজগৎকে ডুবাইয়াছেন—জড় ও চৈতন্যের পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে, পরমশিবপ্রেমময়ীর যে বিচিত্র মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—তাহা দেখিলেই বোধ হয়, যেন দ্বৈত অদ্বৈত দুইটি শিশু পরস্পর বিবাদ করিয়া দুই জনেই অভিমানে উন্মত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল—মা কাহাকে আদর করেন, কাহাকে তিরস্কার করেন, জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্গ্রীব হইল—জননী অমনি উভয় অভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া উভয়কে উভয় ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন—আপন আপন সোহাগভরে উভয়েই গলিয়া পড়িল—মায়ের প্রেমে, মা-ময় হৃদয়ে, মাকে দেখিতে দেখিতে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া উভয়েই মায়ের ক্রোড়ে ঘুমাইল, মাকে পাইয়া বিবাদ বিসম্বাদ সব যেন মিটিয়া গেল। সাধকবর্গ এই স্থানে "তন্ত্র বেদের বিষম বিচার মাকে লয়ে" এই শীর্ষক গীতাঞ্জলির শেষ সঙ্গীতটি দেখিলে বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

আধুনিক অদ্বৈত বাদে অনিত্যবাদ।

পূর্ব্বতন সিদ্ধ সাধকগণের অনেক চিত্রই আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইবে। এ স্থানে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের দুইটি আনন্দ বিষাদ চিত্র আমরা আধুনিক ক্ষেত্র হইতেই উদ্ধৃত করিলাম—যদিও ইহা বেদান্তমতসিদ্ধ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের চিত্র নহে। তথাপি সেই ছায়ায় রচিত বলিয়া গৃহীত হইল। এরূপ গ্রহণ তন্ত্রতত্ত্বের পক্ষে সমুচিত না হইলেও ধর্ম্মবিপ্লবের বিকারে আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া সাধকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। দ্বৈত জগতের বিভীষিকাগ্রস্ত ভাবুক বলিতেছেন—

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনেও কি তা জান না।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, এক বার ভাবিলে না।

অত এব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমোগুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না।

তান্ত্রিক সাধক মহাত্মা দিগম্বর ভট্টাচার্য্য এই গানেরই উত্তর দিয়াছেন—

* * মত্ত মন অপার বাসনা,
দেহ সত্য, মন সত্য, সত্য শ্যামা-সাধনা।
শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, আসে যায় রয় হয়,
পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা।
অতএব শুন বলি, ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি,
সত্যময়ীতত্ত্ব লও, যাবে মিথ্যা ভাবনা।

সাধক একবার এই স্থানে উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়া লইবেন। অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন, "অনিত্য যে, দেহ মন, জেনেও কি তা জাননা?" দেহ মনের অনিত্যতা জানিয়াও দিগম্বর বলিতেছেন, সংসারে অনিত্য হইলেও উপাসনা রাজ্যে "দেহ সত্য মন সত্য সত্য শ্যামাসাধনা" দেহ মন যদি মিথ্যাই হয়, তবে মিথ্যা উপকরণের সাধনায় সত্য সনাতনী মাকে পাইব কিরূপে? আর মিথ্যা মন দিয়া তুমিই বা তোমার নিরঞ্জনকে ভাবিবে কি করিয়া? মিথ্যা সংসারের অনুসরণ করিলে, যে দেহ মন মিথ্যা হইয়া যায়, সত্যতত্ত্বস্বরূপিণীর অনুসন্ধানে প্রবেশ করিলে, সেই দেহের কার্য্য মনের কার্য্যই আবার সত্য হইয়া দাঁড়ায়; নতুবা তোমার মতেও দেহ মন যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যা দেহের, মিথ্যা মনের, ভয় কেন এত সত্য হয়? তার পর অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্তু তুমি কোথা রবে—একবার ভাবিলে না। এই কথা গুলি কিন্তু, আস্তিকের মুখে শোভা পায় না। যে জগতে বার তিথি মাস আছে, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু আছে—আমি যেন সে জগৎ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই, জগতের আবর্ত্তন—পরিবর্ত্তনশীল সমস্ত